



শার্ল পেরো-র
রূপকথা

তরজমা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



শার্ল পেরো-র
রূপকথা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো বই

নজরুল
পোপোল বু
সোনার দুয়ার
ল্যাম্পোস্টের বেলুন
ঘণ্টা বাজে দূরে
দানোরা সব পাশেই আছে
রাজা এবং ছোট্ট মানুষ
স্রষ্টা যখন সর্বপ্রথম বানিয়েছিলেন সকল প্রাণী
হাতি ইঁদুর প্যাঁচার ছানা/তাদের আজব কাণ্ড নানা
ছবির মধ্যে ছবি
চার নম্বর ব্রিজ! হুঁশিয়ার!
কুহেলি
আলিবাবার গুহা
যে-পুতুল পালিয়ে গেলো
কানামাছি
খেল সমাচার
গণ্ডি
খেলা অমনিবাস (১ ও ২)
গোয়েন্দা অমনিবাস
রহস্যময় রোমাঞ্চকর
কার কাছ থেকে পালাবে?

অনুবাদ

এডওয়ার্ড লিয়ার *আষাঢ়ে বই*
জুল ভের্ন *শ্রেষ্ঠ গল্প*
জুল ভের্ন *গল্পসংগ্রহ*
জুল ভের্ন অমনিবাস (১–৫)
আর্থার কোনান ডয়েল *চারজনের চিহ্ন*
আর্থার কোনান ডয়েল *বাস্কারভিলদের হাউন্ড*
স্তানিসোয়াভ লেম *পৃথিবী কী ক'রে বাঁচলো*
স্তানিসোয়াভ লেম *মুখোশ ও মৃগয়া*
মর্‌ডেকাই রিচলার *জেকব দুই-দুই ও ফণাধর দন্তপাটি মুখোমুখি*
র্যানডল্‌ফ স্টো *মিডনাইট*
আডালবের্ট স্টিফ্‌টার *কাচপাহাড়*
জোর্জে আমাদু *এক পাখি দোয়েলা আর এক বেড়াল হুলো*
ক্রিস্টফার নিক্সন *দুর্জয় সফর*

সম্পাদিত

জিয়নকাঠি
হরবোলা

শার্ল পেরো-র

রূপকথা



তরজমা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

CHARLES PERRAULT-R RUPKATHA
(A Translation of the Fairy Tales of Charles Perrault)
Translated by Manabendra Bandyopadhyay
Published by Sudhangshusekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 40.00

ISBN-81-295-0543-6

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫, পৌষ ১৪১২

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ
ভিতরের উডকাট : মূল ফরাশি সংস্করণ (১৬৯৭, পারি) থেকে

দাম : ৪০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

শ্রী বিনীতা ঘোষ, শ্রী দেবাশিস সেন ও
শ্রী সুগত রায়কে—
এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের জন্যেও—

গল্প তো শুধু ঘটনা বলে না, রইয়ে-সইয়ে সাজিয়েই বলে,
অর্থাৎ তার যত আবেদন থাকে বলবার কৃৎকৌশলে।
লোকের মুখের গল্প ও গাথা প্রাণ পায় তাই বলারই ছন্দে,
সব চেনা কথা ভ'রে যায় তাই কত বিভঙ্গে, নব আনন্দে।
ঠিক এই কাজই ক'রে গিয়েছেন শার্ল পেরো তাঁর নিজের লেখায়,
পুরোনো, অথচ এখনও-নতুন, সে-সব গল্প কত-কী শেখায়।
ফরাশি দেশের লোককথা বুঝি? কিন্তু সে তাঁর নিছক বাহানা—
গল্পের মাঝে সময় সমাজই চেনা মুখ প'রে তাই দেয় হানা।
রূপকথা বটে, কিন্তু সেটা তো ছিলো ওস্তাদি লেখার ভঙ্গি—
সেইজন্যেই এই লেখাগুলো ছোটো থেকে বড়ো সবারই সঙ্গী।

সূচনাকথা

ইওরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সকলেরই মনের মতো, রূপকথাগুলি এসেছিলো তিনটি মুদ্রিত উৎস থেকে : শার্ল পেরো, ইয়াকব আর ভিলহেল্ম গ্রিম, এবং হান্স আন্ডেরসেন। পেরো লিখেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে, শিক্ষিত ও সুকুমার-রুচি ফরাশি পাঠকদের জন্যে ; আর লোককথা যদি ব্যবহারও ক'রে থাকেন তবে তাদের তিনি সাজিয়ে নিয়েছিলেন নিজের পছন্দসই ভাষা ও ভঙ্গিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আলেমান গ্রিম ভাইদের উদ্দেশ্য ছিলো পুরোপুরি আলাদা : তাঁরা নিজেদের দেখেছিলেন লৌকিক কথ্য ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিশেবে, প্রায় মুখের কথাকেই ধ'রে রাখতে চাচ্ছিলেন লিখিত ভাষায়, মুদ্রিত রূপে। আর হান্স আন্ডেরসেন যদি-বা দিনেমার লোককথাকে নিজের মতো ক'রে জড়ো করেছিলেন, তবু তাঁর সব রূপকথা পেরোর চাইতেও বেশি ক'রে তাঁরই নিজস্ব—একান্ত আপন—হ'য়ে উঠেছিলো : তিনি শুধুমাত্র ছেলেবেলায় যে-সব গল্প শুনেছিলেন তাঁর ওপরই নির্ভর করেননি, নিজেও আশ্চর্য ও চমৎকার সব রূপকথা লিখে গিয়েছিলেন।

শার্ল পেরো (১৬২৮-১৭০৩) এসেছিলেন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে, চতুর্দশ লুইকে যে-পরিবার অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উপহার দিয়েছিলো। তাঁর এক ভাই ক্লোদ ছিলেন স্থপতি, লুভ্‌র্ সংগ্রহশালার পুবদিকের ফটক তাঁরই সৃষ্টি, আর পারি তারামণ্ডল বা মানমন্দিরও তাঁর কীর্তি। অন্য দুইভাই একটু-আধটু লিখেছিলেন, আর এঁদেরই একজন অর্থমন্ত্রকের সচিব ছিলেন। শার্ল পেরো নিজে রাজভবনগুলির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আর ফরাশি আকাদেমির সদস্য হয়েছিলেন।

তাঁর গদ্যে লেখা রূপকথাগুলো বেরিয়েছিলো ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে, পরে অবশ্য তিনি ছন্দমিলেও অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, যখন কিছু-কিছু রূপকথা লিখেছিলেন কবিতায়।

তাঁর রূপকথার বইয়ের গোড়ার দিকের সংস্করণগুলোর মুখপত্রে থাকতো এক থুরথুরে বুড়ির ছবি, আগুন পোহাবার চুল্লির কাছে ব'সে-ব'সে গল্প বলছেন, আর তাঁকে ঘিরে আছে উৎসুক তিনটি রোমাঞ্চিতমুখ বাচ্চা ছেলেমেয়ে। আর বুড়ির মাথার ওপর লেখা ছিলো : *কোঁৎ দ্য মা মের লোয়ে,* যা থেকে পরে রূপকথাগুলো লোকের কাছে চেনা হ'য়ে যায় *টেল্‌স অভ মাদার গুজ* নামে।

এই বাংলা অনুবাদগুলো বিভিন্ন সময়ে বেরিয়েছিলো *সন্দেশ, কিশোর ভারতী, তথ্যকেন্দ্র* ও *অনুবাদ পত্রিকায়*। কথা ছিলো পেরোর মৃত্যুর তিনশো বছর উদ্‌যাপন করার সময়ে বই বেরুবে। বেরুতে একটু দেরি হ'লেও, এখন এ-বই প্রকাশ করার উপলক্ষ হ'লো তাঁর মৃত্যুর ওই তিনশো বছর পূর্তি। একটু শুধু অবাক হবার ব্যাপার আছে এর মধ্যে : শার্ল পেরো কেন-যে আমাদের রূপকথা অনুরাগীদের নজর এতদিন এড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেটাই আশ্চর্য।

৯ পৌষ ১৪১২ — মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা

সূচি



ঘুমিয়ে-পড়া সুন্দরী

এক-যে ছিলো রাজা আর রানি, তাদের ছিলো ভারি মন খারাপ, কারণ তাদের কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। তাদের মন খারাপ যে কতটাই সেটা কথায় ব'লেও বোঝানো যাবে না। জগতের সব পুণ্য কুণ্ডেই গেছে তারা, সব তীর্থে। সবকিছু চেষ্টা করেছে তারা—প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা, সাধুসন্তদের কাছে কত মানতই যে করেছে—কিন্তু তাতে তাদের হাল মোটেই পালটায়নি। অবশেষে, অবিশ্যি, রানির সন্তানসম্ভাবনা হ'লো, তিনি এক মেয়ের জন্ম দিলেন। একটা চমৎকার নামকরণ উৎসবের আয়োজন করা হ'লো। দেশে যত হুরি-পরি ছিলো—তাদের সংখ্যা ছিলো সাত—তাদের সব্বাইকে নেমন্তন্ন করা হ'লো ধর্মমা হবার জন্যে, যাতে তাদের প্রত্যেকেই একটা ক'রে উপহার নিয়ে আসে (পরিদের মধ্যে সেটাই রেওয়াজ ছিলো তখন), যাতে ছোট্ট রাজকুমারী যত সদ্‌গুণ কল্পনা করা যায় তার প্রত্যেকটি পেয়ে যায়।

নামকরণের উৎসব সাঙ্গ হ'লো, সব্বাই দল বেঁধে চ'লে এলো রাজবাড়িতে, যেখানে হুরি-পরিদের ভুরি-ভোজের জন্যে দারুণ একটা আয়োজন করা হয়েছিলো। তাদের প্রত্যেকের সামনে পেতে দেয়া হ'লো বিশেষ জমকালো একেকটা আসন, সামনে নিরেট সোনার বাক্সে রইলো ছুরি, কাঁটা আর চামচে—সব চমৎকার সোনায় তৈরি, আর সে-সবের ওপর বসানো হিরে আর চুনি। কিন্তু যেই তারা যে যার জায়গায় বসতে যাবে,

ও মা, ওই কে এসে হাজির হ'লো? সে হ'লো বুড়ি থুরথুরি এক পরি, তাকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি, কারণ গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে—কিংবা তারও বেশি সময় হবে—সে ছিলো এক মিনারের কুঠুরির মধ্যে বন্ধ, আর সব্বাই ধ'রে নিয়েছিলো সে বুঝি ম'রেই গিয়েছে কিংবা কারু কোনো জাদুর বলে সম্মোহিত হ'য়ে আছে।

রাজা তক্ষুনি হুকুম করলেন তারও জন্যে একটা আসন পেতে দেবার জন্যে, কিন্তু তখনই আর তাকে অমনতর সোনার একটা বাক্স দেয়া সম্ভব হ'লো না, কারণ জানাচেনা সাতজন পরির জন্যেই শুধু সাতটা বাক্সই জহুরিকে দিয়ে বানানো হয়েছিলো। বুড়ি পরির ভারি মনে লাগলো, তার মনে হ'লো তাকে বুঝি তাচ্ছিল্যই করা হচ্ছে, আর দম চেপে সে মজা দেখিয়ে দেবে ব'লে বিড়বিড় করলে। তরুণী পরিদের একজন তার পাশেই ব'সে ছিলো, এই বিড়বিড় বকুনি সে শুনতে পেলে, আর ধ'রেই নিলে যে এ নিশ্চয়ই রাজকুমারীর অমঙ্গল করার জন্যেই কোনো উপহার দেবে। কাজেই, যেই ওই ভোজ শেষ হ'য়ে গেলো, সে গিয়ে একটা নকশা-আঁকা ভারি পর্দার পেছনে লুকিয়ে রইলো। এইভাবে সে-ই সবার শেষে উপহার দেবে, আর তাতে হয়তো—অন্তত যতটা তার সাধ্যে কুলোয়—বুড়ি পরির সব অলুক্ষুনে শাপের একটা জবাব দিতে পারবে।

এর মধ্যেই, অন্য পরিরা রাজকুমারীকে তাদের মহার্ঘ সব উপঢৌকন দিতে শুরু ক'রে দিয়েছে। সবচেয়ে যার বয়েস কম, সে তাকে দিলে নিখুঁত রূপ ; পরের জন বললে রাজকুমারী হবে পরমাশ্চর্য এক বাক্‌পটু বুদ্ধিমতী হাসিখুশি মেয়ে ; তৃতীয় জন বললে তার চলন-বলনে থাকবে অপূর্ব স্নিগ্ধ সুষমা ; চতুর্থ জন বললে সে হবে দুর্দান্ত নৃত্যপটীয়সী ; পঞ্চম জন বললে রাজকুমারী গান গাইবে ঠিক এক বুলবুলের মতোই ; আর ছ-নম্বর পরি বললে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রকেই সে নিখুঁতভাবে বাজাতে পারবে, ঠিক এক ওস্তাদের মতো। আর যখন বুড়ি পরির পালা এলো, সে বয়সের ভারে থরথর করছিলো না, বরং থরথর করছিলো বেজায় রাগে, আর সে বললে রাজকুমারী তার হাতে একটা ববিনের কাঠি ঘোরাতে গিয়ে হাতে বিঁধিয়ে ফেলবে, আর তারই ফলে ম'রে যাবে।

যখন তারা এই মারাত্মক ভেটটির কথা শুনতে পেলে, পুরো জমায়েতটার মধ্যে ভীষণ-একটা শিহরন খেলে গেলো, কেউই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না, সকলেরই চোখ থেকে দরদর ক'রে জল ঝরতে লাগলো। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পর্দায় আড়াল থেকে তরুণী পরিটি বেরিয়ে এলো, আর বললো:

'রানিমা, রাজামশাই, আপনারা আপনাদের সামলে রাখুন, কোনো ভয় পাবেন না, আপনাদের মেয়ে ওই ববিন হাতে ফুটিয়ে মরবে না। সত্যি-যে আমার গুরুজন যা করেছেন তার পুরো ফাঁসটার গেরো আমি খুলতে পারবো না। রাজকুমারীর হাতে কাটিম, মাকু বা ববিন কিছু-একটা বিঁধেই যাবে। তবে, মরবার বদলে, সে শুধু এক গভীর ঘুমে ঢ'লে পড়বে, যে-ঘুম চলবে একশো বছর ধ'রে, আর শতক কেটে গেলেই এক রাজপুত্র আসবে তাকে ঘুম থেকে জাগাতে।'

যে-সর্বনাশের কথা ওই বুড়ি পরি শুনিয়ে গেছে সেটা বানচাল করার আশায় রাজামশাই তক্ষুনি ঘোষণা ক'রে দিলে তার রাজ্যে এখন থেকে কোনো প্রজাই আর মাকু বা কাটিম বা ববিন ঘোরাতে পারবে না—এমনকী তাদের বাড়িঘরে কোনো মাকু, কাটিম, ববিন রাখতেও পারবে না—রাখলেই সাজা হবে মৃত্যু।

পনেরো-যোলো বছর পর রাজারানি যখন তাদের একটা বাগানবাড়িতে বেড়াতে গেছে, রাজকুমারী তখন কেল্লার মধ্যে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছিলো। ঘর থেকে ঘরে ছুটে-ছুটে যাচ্ছিলো সে, শেষটায় গিয়ে পৌঁছেছিলো একটা মিনারের একেবারে চুড়োয়, আর সেখানে এসে দ্যাখে এক বুড়ি ব'সে-ব'সে আপন মনে সুতো বুনে চলেছে। ওই সব মাকু বা কাটিম বা ববিন যে আর ব্যবহারই করা যাবে না, বুড়ি সেই কথা কখনও শোনেইনি।

'কী করছো গো তুমি?' রাজকুমারী তাকে শুধোলে।

'সুতো বুনছি, বাছা,' বুড়ি জানতোও না এই কিশোরী আসলে কে।

'বাঃ, ভারি সুন্দর তো!' রাজকুমারী ব'লে উঠলো। 'কেমন ক'রে সুতো বোনো, দেখাও তো! আমাকে একটু দেবে, আমিও চেষ্টা ক'রে দেখবো।'

হাতে নিয়েছে কি নেয়নি—একটু তাড়াই করেছিলো সে, আর ভালো ক'রে খেয়ালও করেনি, আর তাছাড়া পরিরা তো তার কপালে ব্যাপারটা লিখেই গেছে—সে ববিনটা হাতে ঘোরাতে গিয়ে বিঁধে ফেললো আর তক্ষুনি জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলো।

বুড়ি তো ভয়ে প্রায় ভির্মিই খেয়ে যায়, অস্থির হ'য়ে সে 'কে আছো, বাঁচাও!' ব'লে চ্যাচামেচি জুড়ে দিলে। রাজবাড়ির সবখান থেকেই লোকজন সব ছুটে এলো। তারা রাজকুমারীর চোখেমুখে জল ঢাললো, তার আঁটো ক'রে বাঁধা জামার ফিতে খুলে দিলো, হাত কচলে-কচলে সাড় ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগলো, রোজমেরির আতর দিয়ে কপাল ঘ'সে দিলো, কিন্তু কিছুই আর তার জ্ঞান ফেরাতে পারলো না।

তারপর খোদ রাজা, সে ততক্ষণে প্রাসাদে ফিরে এসেছে, এত হই-হল্লা কিসের দেখবার জন্যে ওপরে উঠে এলো, আর তার মনে প'ড়ে গেলো বুড়ি পরির ওই অলুক্ষুনে অভিশাপ। এ যে ঘটতোই, কারণ পরিরা তো তা-ই ব'লে গিয়েছিলো। সে ধরাধরি ক'রে রাজকুমারীকে প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর ঘরটায় নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করলে, তাকে শোয়ালে সোনারুপোর জরির কাজ-করা এক বিছানায়। রাজকুমারীকে দেখাতে লাগলো সে যেন কোনো ফরিশ্‌তারই মেয়ে—সে এতই সুন্দরী। তার এই অজ্ঞান হ'য়ে-যাওয়া কিন্তু তার মুখটাকে বিবর্ণ ক'রে দেয়নি, তার গাল দুটো এখনও গোলাপি, ঠোঁট দুটি যেন প্রবাল। তার চোখ দুটি বোজা, কিন্তু একটু কান পেতে শোনা যায় সে খুবই আস্তে-আস্তে শ্বাস নিচ্ছে, যাতে স্পষ্ট বোঝা গেলো সে এখনও ম'রে যায়নি।

রাজা হুকুম দিলে তাকে যেন শান্তিতে ঘুমুতে দেয়া হয়—যতদিন-না সেই শুভক্ষণ আসে যখন সে আবার জেগে উঠবে। সেই-যে লক্ষ্মীসোনা পরিটি তাকে একশো বছর ঘুমিয়ে থাকার কথা ব'লে তাকে মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলো, ওই দুর্ঘটনার সময় সে ছিলো মাতাকোয়াঁ রাজ্যে, বারো হাজার লিগ দূরে, কিন্তু তার কাছে তক্ষুনি খবর নিয়ে এলো এক খুদে বামন, তার পায়ে সাত-লিগ কদমের জুতো (হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যি-সত্যিই ওই জুতো প'রে একেক কদমে সাত-সাত লিগ পেরিয়ে যাওয়া যায়)। পরি তক্ষুনি ড্র্যাগনদের টানা এক আগুনের রথে ক'রে রওনা হ'য়ে পড়লো আর এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে এসে পৌঁছুলো। রাজা এগিয়ে এলো রথ থেকে নামবার সময় হাত বাড়িয়ে তাকে ধ'রে থাকবে ব'লে। রাজা যা-যা ব্যবস্থা করেছে, সব দেখে-টেখে পরি তারিফই করলে, অনুমোদনের ভঙ্গিতে। তবে, সে যেহেতু অতীব দূরদর্শী, সে ভেবে দেখলে, রাজকুমারী যখন শেষটায় জেগে উঠবে, সে নিশ্চয়ই ওই পুরোনো কেল্লাটার মধ্যে নিজেকে একেবারে একা আছে দেখে খুব ঘাবড়ে যাবে। তো তা-ই সে যা-যা করার করলে।

কেল্লার সবকিছুই সে তার কুহককাঠি দিয়ে ছুঁয়ে দিলে—শুধু রাজা-রানিকে ছোঁয়নি : গবর্নেস, পরিচারিকা, দাস-দাসী, হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে-থাকা সব সুজন, গেরস্থালির সব কর্মচারী, খানশামা, বাবুর্চি, বাসন মাজার ছোকরা চাকর, শরা থেকে যে জল ঢালে, পাহারাওলা, দারোয়ান, ফাই-ফরমাশ খাটার লোকজন, চাপরাশি, বেয়ারা—কাউকে বাদ দেয়নি। সে আস্তাবলের সবগুলো ঘোড়াকেও তার কুহককাঠির ছোঁয়া দিলে, সহিসদেরও, কোচোয়ানদেরও, বড়ো-বড়ো পাহারা কুত্তাদেরও, আর ছোট্ট পাফ্‌কেও—সে কিনা রাজকুমারীর খুব আদরের আহ্লাদি কুকুরছানাই—সব সে তার হাতের কাঠি দিয়ে ছুঁয়ে দিলে। ছোঁবামাত্র তারা সবাই ঘুমিয়ে

পড়লো; তারা জেগে উঠবে শুধু তখনই যখন তাদের মালকিন রাজকুমারী চোখ মেলে চাইবে, যাতে তার যখন যা দরকার হবে সব জুগিয়ে দিতে পারে। এমনকী তন্দুরগুলো, যেখানে শিককাবাব ঝলসানো হচ্ছিলো, তারাও ঘুমিয়ে পড়লো, তন্দুরের আগুনও। সবকিছু হ'য়ে গেলো চক্ষের পলকে—পরিরা অবিশ্যি সবকিছুই করে ঝড়ের বেগে।

তাকে না-জাগিয়েই রাজারানি তাদের প্রিয় বাছাটিকে চুমু খেয়ে কেল্লা ছেড়েই চ'লে গেলো, যাবার আগে হুকুম দিয়ে গেলো কেউ যেন তার ধারে-কাছেই না যায়। এই হুকুম-টুকুম অবিশ্যি জরুরি ছিলো না, কারণ পনেরো মিনিটের মধ্যেই সেখানে—চারপাশেই—গজিয়ে গেলো ছোটো-বড়ো কত গাছ, বৈঁচির ঝোপ, জট পাকানো কাঁটাগাছ, যার মধ্যে দিয়ে মানুষ বা জানোয়ার কেউ যায় সাধ্য কী? শুধু মিনারগুলোর উঁচু-উঁচু চুড়ো ছাড়া আর-কিছুই দূর থেকে দেখা যায় না—অর্থাৎ তাও দেখা যায় অনেকটা দূর থেকেই। এটা স্পষ্ট বোঝা গেলো পরি কিনা সেখানেও কুহকজাল বিছিয়ে রেখেছে, যাতে সে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ যাতে সেখানে উঁকিঝুঁকি দিয়ে কোনো নজর দিতে না-পারে।

একশো বছর কেটে যাবার পর, তখন যে-রাজা দেশ চালাচ্ছিলো, তারা ঘুমিয়ে-পড়া রাজকুমারীর বংশের কেউ নয়। সেই রাজার ছেলে ওখানটারই আশপাশে মৃগয়ায় বেরিয়েছিলো, সে লোকদের কাছে জানতে চাইলো ওই-যে ঘননিবিড় গাছপালার ওপর দিয়ে দূরে বেশ কতগুলো মিনার দেখা যাচ্ছে, ওগুলো কী।

তার সঙ্গীসাথীরা একেকজনে একেক রকম গল্প শোনালে—তারা নিজেরাই যে কত অদ্ভুত কাহন শুনেছে। কেউ বললে ওই কেল্লাটা ভুতুড়ে—ওখানে ভূতপ্রেত থাকে ; অন্যরা বললে, এ-তল্লাটে যত পরি আছে, তারা সবাই ওখানে প্রতি সপ্তাহেই জিরিয়ে নিতে যায়। সবচেয়ে বেশি লোক যা বিশ্বাস করে তা আবার বেশ আতঙ্কের : এক মানুষখেকো রাক্ষস নাকি ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের ওখানে ধ'রে নিয়ে যায়, যাতে ধীরে-সুস্থে নিরুপদ্রবে তাদের দিয়ে তার ভুরিভোজ সারতে পারে—কারণ সে-ই শুধু ওই ঘননিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতে পারে।

রাজকুমার তো ভেবেই পেলে না কার কথাটা বিশ্বাস করা যায় ; এমন সময় এক বুড়ো থুরথুরে চাষী এগিয়ে এসে তাকে বললে :

'আজ্ঞে, হুজুর, পঞ্চাশ বছরেরও আগে হবে, আমি আমার বাবার মুখে শুনেছিলুম যে ওই কেল্লায় নাকি পরমাসুন্দরী এক রাজকুমারী থাকে—ঠিক যেন ডানাকাটা এক পরি। বাবা বলেছিলো, রাজকুমারীকে নাকি ওখানে একশো বছর প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুতে হবে শেষটায় তাকে জাগাতে পারবে কোনো রাজপুত্রই, তার জন্যেই নাকি সে উদ্দিষ্ট হ'য়ে আছে।'

এই কথাগুলো রাজকুমারের কানে যেন এক দারুণ উদ্দীপনার ঢেউ তুলে দিলে। সে ঠিক নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিলো এই দুঃসাহসী কাজটা সে-ই হাঁসিল করতে পারবে; আর একটা কীর্তি স্থাপন করার প্রেরণায়, এবং অদেখা রাজকুমারীর প্রেমে প'ড়ে গিয়ে, সে ঠিক করলে এক্ষুনি সে পরখ ক'রে দেখবে এই গল্পটা সত্য না মিথ্যা। আর যেই সে বনের মধ্যে ঢুকলো, অমনি আপনা থেকেই সব বড়ো-বড়ো গাছ, বৈঁচি ঝোপ, কাঁটাগুল্ম সব এ-পাশে ও-পাশে হেলে গিয়ে মাথা নুইয়ে তার যাবার পথ ক'রে দিলে। রাজকুমার কেল্লাটার দিকে এগিয়ে গেলো, এক মস্ত বনবীথির ওপাশে কেল্লাটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো এখন। তার অনুচরেরা কেউই যে তাকে অনুসরণ ক'রে তার পেছন-পেছন আসছে না, এটা দেখে সে একটু অবাকই হ'লো, কিন্তু তাই ব'লে এই চিন্তাটা তাকে তার চলার পথ থেকে ফেরাতে পারলে না। কোনো রাজকুমারের বয়েস যখন কম হয় আর তখন যখন সে প্রেমে প'ড়ে যায়, তখন তার মতো ডাকাবুকো আর দুঃসাহসী কেই বা হয়।

সে গিয়ে পৌঁছুলো কেল্লার দেউড়িতে, সেখানে যা-যা তার চোখে পড়লো তার সবকিছুই হয়তো আতঙ্কে তাকে অবশ ক'রে ফেলতো। এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সেখানে। সবখানেই মরণের চিহ্ন। জায়গাটা মানুষ আর জীবজন্তুর ঠায়-প'ড়ে-থাকা শরীরে ভর্তি, দেখে মনে হয় সবাই বুঝি মারাই গিয়েছে। কিন্তু রাজকুমার একটু বাদেই দেখতে পেলে দারোয়ানদের লাল-লাল নাকের ডগা আর রাঙা গালগুলো, তাতে বোঝা গেলো তারা শুধু ঘুমিয়েই আছে ; আর তাদের সব গেলাসে তখনও কয়েক ফোঁটা ক'রে মদ আছে, যেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলে যে তারা পান-আহ্লাদ করতে-করতেই ঘুমে ঢ'লে পড়েছে।

সে গিয়ে ঢুকলো মস্ত এক অঙ্গনে, তার পুরোটাই মর্মর পাথরে শান-বাঁধানো, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে সে পৌঁছে গেলো পাহারাদারদের ঘরে, সেখানে দু-সার বেঁধে আছে পাহারাদারেরা, তাদের গাদা বন্দুকগুলো—ওই যাদের *অর্কেবাস* বলে—তাদের কাঁধেই আছে, কিন্তু জোরে-জোরে নাক ডাকাচ্ছে সব্বাই। সে পর-পর বেশ কতগুলো ঘর পেরিয়ে এলো, সেখানে কত মহিলা আর ভদ্রসুজন ঘুমিয়ে আছে, কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঘুম লাগাচ্ছে, কেউ-বা ব'সে-ব'সে। অবশেষে সে এসে পৌঁছুলো সেই ঘরে যার প্যানেলগুলো সব সোনার, আর সে দেখতে পেলে একটা বিছানা, যার পর্দাগুলো পাশে সরানো, আর সেখানে এমন চমৎকার দৃশ্য তার চোখে পড়লো যা সে আগে কখনও তার চর্মচক্ষুতে দ্যাখেনি: পনেরো-ষোলো বছরের এক রাজকুমারী সেখানে শুয়ে আছে, তার ঝলমলে রূপ যেন স্বর্গের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে। অবাক বিস্ময়ে কাঁপতে-কাঁপতে রাজকুমারীর কাছে গিয়ে সে উবু হ'য়ে বসলো।

তারপর, কুহকী মায়াজাল যেই শেষ হ'য়ে গেলো, রাজকুমারী জেগে উঠলো, আর কেমন স্নিগ্ধ আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে—প্রথম দেখাতেই এমনটা হওয়া হয়তো রীতি নয়—তাকিয়ে বললে :

'তুমিই না কি, আমার রাজকুমার?' সে বললে, 'এসে পৌঁছুতে তুমি তো অনেকটাই সময় লাগিয়ে দিয়েছো!'

এ-কথা শুনে খুশিতে ডগমগ হ'য়ে—কথার চেয়ে বেশি কথার সুরে—রাজকুমার ঠিক ভেবেই পেলে না কেমন ক'রে সে তার আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার বোধ প্রকাশ করবে। সে দিব্যি গেলে বললে রাজকুমারীকে সে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবেসে ফেলেছে। তার কথাগুলো হ'লো কেমন যেন থতমত, বাঁধো-বাঁধো, তবে রাজকুমারী কিন্তু তাকে তো-তো করতে দেখেই আরো খুশি হ'য়ে গেলো ; কারণ জিভ যত কম সড়গড় হয় ভালোবাসা তত বেশি জোরালো হয়। রাজকুমারীর চাইতেও রাজকুমার কিন্তু বেশি বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলো—আর তাতে মোটেই অবাক হবার কিছু নেই। সে তো অনেক সময় পেয়েছে রাজকুমারকে দেখে সে কী বলবে সে-কথা ভাবতে, কারণ এটা মনে হয় খুবই সম্ভব (যদিও কাহনটা কিন্তু তা বলে না) যে ওই ভালো পরি তার ঘুমটাকে মধুর সব স্বপ্নে ভরিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করেছিলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টাই তারা কাটিয়ে দিলে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে, অথচ তখনও কিন্তু তারা যা বলতে চাচ্ছিলো তার আদ্ধেক কথাও সারা হয়নি।

এদিকে রাজকুমারীর সঙ্গে-সঙ্গেই গোটা কেল্লাটাই কিন্তু জেগে উঠেছে। উঠেই যে যার কাজে লেগে পড়েছে, আর তারা সবাই যেহেতু প্রেমে ডগমগ হ'য়ে নেই, তারা খিদেয় প্রায় ম'রে যেতেই বসেছে। রাজকুমারীর প্রধানা সহচরী, অন্যদের মতো সেও খিদের জ্বালায় ম'রে যাচ্ছে তখন, একটু অধীরই হ'য়ে উঠলো, আর প্রায় চেঁচিয়েই জানালে রাতের খাবার তৈরি হ'য়ে গেছে। রাজকুমার হাত বাড়িয়ে রাজকুমারীকে বিছানা ছেড়ে উঠতে সাহায্য করলে। সে তো জমকালো ঝলমলে পোশাক প'রেই শুয়েছিলো, আর রাজকুমার অনেক ক'রে নিজেকে সামলে রাখলে—এ-কথা বললে না যে তুমি দেখছি আমার দাদিমার মতোই সেজে

আছো, এমনকী ওই মাড়-দেয়া উঁচু কলারটা শুদ্ধু। সেজন্যে অবিশ্যি তাকে কম সুন্দর দেখাচ্ছিলো না।

তারা এক বড়ো-বড়ো মুকুর বসানো হলঘরে চ'লে গেলো, সেখানেই তারা নৈশভোজ সারলে আর আশপাশে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো রাজকুমারীরই বাবুর্চি খানশামারা। বেহলা আর সানাই শোনালে মনভোলানো কানভোলানো সব সুর, প্রায় একশো বছর কেউ যে-সব সুর শোনেনি। আর নৈশভোজের পরেই, গির্জের যাজক মশাই প্রাসাদেরই চ্যাপেলে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন—আর এক্‌ফোঁটাও দেরি না-ক'রে তার প্রধানা সহচরী তাদের বিছানার চারপাশে পর্দা টেনে দিলে। তারা ঘুমুলো খুব কমই। রাজকুমারীর তো ঘুমটুম এখন আর জরুরি নয়, আর রাজকুমারকে তো রাত ভোর হ'লেই চ'লে যেতে হবে নগরে—যেখানে রাজা নিশ্চয়ই তার জন্যে ভারি অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

রাজকুমার গিয়ে রাজাকে বললে সে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলো আর রাতটা সে কাটিয়েছে এক কয়লাওলার কুঁড়েঘরে, যেখানে রাত্তিরে সে খেয়েছে কালো রুটি আর পনির। রাজা খুব শাদাসিধে ধরনের মানুষ, ছেলের কথা তার বিশ্বাস হ'লো। রানি-মা অবশ্য তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি : আর যেই দেখলো রোজই সে মৃগয়ায় বেরিয়ে যায় আর রাতে না-ফিরলে মুখের ডগায় তৈরি থাকে কোনো ওজর, ওজুহাত বা কৈফিয়ৎ, ছেলে যে কারু প্রেমে পড়েছে এ-বিষয়ে তার আর কোনো সংশয় রইলো না। রাজকুমার ততদিনে দু-বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছে রাজকুমারীর সঙ্গে, আর তাদের দুটি ছেলেমেয়েও হ'য়ে গেছে। প্রথমটি মেয়ে, নাম ঊষা ; আর ছোটোটি ছেলে, নাম বাসর, কারণ সে তার বোনের চেয়েও সুন্দর দেখতে।

বেশ কয়েকবারই রানি ছেলেকে তার কাছে সব কথা খুলে বলবার জন্যে পেড়াপিড়ি করছে—এই ব'লে যে জীবনে কেউ যে সুখ-আহ্লাদ করবে এ তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। রাজকুমার কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে মাকে গোপন কথাটি বলতে পারেনি। যদিও মাকে সে খুবই ভালোবাসে, তবু তাকে সে ভয় পায়, কারণ মা এসেছে এক হাউ-মাউ-খাঁউ কোনো বংশ থেকে, আর রাজা তাকে বিয়েই করেছিলো সাত রাজার ধনের লোভে। কানাঘুষোয় এমন কথাও শোনা যায় রানির নাকি রাক্ষুসে খাই-খাই আছে, আর যখনই কোনো কচিকাঁচাকে দেখতে পায় অনেক ক'রে নিজেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মুখে পুরে দেয়া থেকে সামলে রাখে। সেইজন্যেই রাজকুমার বিশ্বাস ক'রে তাকে কিছু খুলে বলতেই চাচ্ছে না।

কিন্তু দু-বছর বাদে রাজা যখন ভবলীলা সংবরণ করলে, রাজকুমারই নতুন রাজা হ'য়ে বসলো আর তার বিয়ের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রে খুব জাঁকজমক ক'রে তার স্ত্রী ওরফে নতুন রানিকে কেল্লা থেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে আনতে গেলো। নতুন রানি যখন রাজধানীতে এসে পৌঁছুলো, সঙ্গে দু-পাশে তার ছেলে আর মেয়ে, বাসর আর ঊষা, তখন তাকে এক দুর্দান্ত রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হ'লো।

তার কিছুদিন বাদে, রাজা গেলো যুদ্ধে—তার প্রতিবেশী রাজা সম্রাট কান্তালাবুত্তোর সঙ্গে লড়াই। রানিমার হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে সে যুদ্ধে গেলো, যাবার আগে পই-পই ক'রে ব'লে গেলো তার বউ আর ছেলেমেয়েদের যেন খুব যন্ত্রআত্তি সমাদর করা হয়। পুরো গ্রীষ্মকালটাই তাকে লড়াইয়ের ময়দানে কাটাতে হবে। সে চ'লে যাবার পরক্ষণেই রানি-মা তার ছেলের বউ আর কচিকাঁচাগুলোকে বনের মধ্যে এক বাগানবাড়িতে পাঠিয়ে দিলে, যেখানে সে তার ভয়ংকর হাউ-মাউ-খাঁউ খাই-খাইটাকে অনেক সহজে মেটাতে পারবে। সে নিজেই তাদের কাছে ক-দিন বাদে গিয়ে হাজির, আর এক সন্ধ্যায় সে তার বাবুর্চিকে বললে :

'কাল নৈশভোজে আমি ছোট্ট ঊষাকে পাতে পেতে চাই।'

'কিন্তু রানি-মা...' বাবুর্চি কী-একটা কথা বলতে গেলো।

'এটা আমার খাইশ,' রানি-মা বললে (তার গলা শোনালো এক রাক্ষুসির গলার মতো, নরমাংসের লোভে যেটা উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছে)। 'আর আমি চাই যে তার সঙ্গে পাতে যেন থাকে সর্ষেবাটা আর পেঁয়াজকুচির ঝোল।'

বেচারা বাবুর্চি মনমরা হ'য়ে বুঝতে পারলে কোনো রাক্ষুসির সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, আর তার রামদাটা নিয়ে—সেটাই সবচেয়ে বড়ো দা—ছোট্ট ঊষার ঘরে ঢুকে পড়লো। ঊষার বয়েস তখন মাত্র চার আর সে লাফ-ঝাঁপ ক'রে খিলখিল ক'রে হাসতে-হাসতে এসে তার দুই ছোট্ট হাত দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধ'রে তার কাছে মেঠাইয়ের জন্যে বায়না ধরলো। বাবুর্চিটির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো, তার হাত খ'সে রামদাটা মেঝেয় প'ড়ে গেলো। শেষে সে খামারবাড়িতে গিয়ে একটা কচি ভেড়া মেরে এমন মুখরোচক এক ঝোল বানিয়ে রান্না করলে যে রানি-মা ব'লেই ফেললে জীবনে সে এত সুস্বাদু কোনো মাংস খায়নি। এই ফাঁকে বাবুর্চি ছোট্ট ঊষাকে নিয়ে চ'লে গেলো খামারবাড়ির পাশের ছোট্ট কুঁড়েঘরে, যেখানে সে আর তার বউ থাকে, বউয়ের হাতে সে ঊষাকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে স'পে দিলে।

হপ্তাখানেক বাদে পাজির পাঝাড়া লক্ষ্মীছাড়ি রানি-মা বাবুর্চিকে ডেকে বললে :

'আজ রাতের খাবারের সময় ছোট্ট বাসরটাকে পাতে চাই।'

বাবুর্চি আর কোনো কথাই বললে না, মৎলব আঁটলে ঠিক আগের বারের মতোই কৌশল করার। ছোট্ট বাসরকে আনতে গিয়ে দ্যাখে সে তখন ছোট্ট একটা তরোয়াল হাতে তার পোষা বাঁদরটার সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই খেলছে যদিও তার বয়েস কিনা মাত্র তিন। সে তাকে কোলে ক'রে তার বউয়ের কাছে নিয়ে গেলো, ছোট্ট ঊষার সঙ্গেই লুকিয়ে রাখবার জন্যে। আর ভারি কচি একটা পাঁঠা কেটে তার মাংস খেতে দিলে রানি-মাকে, আর তার সোয়াদে রানি-মা তো বেজায় খুশি।

এই অব্দি ব্যাপারটা মোটামুটি ভালোয়-ভালোয় কেটে গিয়েছিলো। কিন্তু এক সন্ধেয় সেই লক্ষ্মীছাড়ি রাক্ষুসি বাবুর্চিকে ডেকে বললে :

'ছেলেমেয়েদের জবাই ক'রে যে-রকম ঝোল রেঁধে খাইয়েছো, আজ ঠিক সে-রকম ঝোলঝাল রেঁধেই মাটাকেও খেতে দিয়ো।'

এ-কথা শুনে, বাবুর্চি বেচারা এবার তাকে কী ক'রে ভোলাবে, সেই ভেবে অস্থির। রানির বয়েস কুড়ির ওপর, ওই-যে একশো বছর ঘুমিয়েছিলো, সেইসব দিন না-গুনেই। তার গায়ের চামড়া একটু শক্ত, যদিও ভারি মসৃণ আর শুভ্রবরন। তার খামারবাড়ির জীবজন্তুর মাঝে অমন শক্ত চামড়ার কোনো জীব সে পাবে কোথায়? যেহেতু এখন তার নিজের জীবনটাই যেতে বসেছে, সে ঠিক করলে এবারে সে রানিকেই জবাই করবে, আর চটপট তার কাজ হাঁসিল ক'রে নেবে ব'লে তার ঘরে গিয়ে হাজির হ'লো। নিজেকেই সে বেজায় তাতিয়ে নিলে, ঝড়ের বেগে দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লো ঘরে, হাতে মস্ত একটা ছুরি। তবে সে কিছু না-জানিয়েই তার গলা কেটে দিতে চায়নি ব'লে রানি-মার কাছ থেকে সে কী হুকুম পেয়েছে সেটাই তাকে খুলে বললে।

'বেশ, তুমি তোমার দায়িত্বটাই পালন করো তবে।' ছুরির কাছে নিজের কলার-খোলা গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে : 'যে-হুকুম তোমায় দেয়া হয়েছে, সেটাই তুমি তামিল করো। এবার তাহ'লে আমি আমার ছেলেমেয়েদের আবার দেখতে পাবো, যাদের কিনা আমি এত ভালোবাসতুম!' কারণ সে ধ'রেই নিয়েছিলো তারা নিশ্চয়ই অপঘাতে মারা গেছে—যেহেতু বিনা বাক্যব্যয়েই তাদের এখান থেকে গায়েব ক'রে দেয়া হয়েছে।

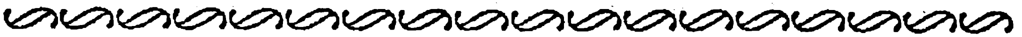
'না, না, মালকিন!' বেচারি বাবুর্চি একেবারেই গ'লে গিয়েছে তখন, 'আপনি মরবেন না আর ছেলেমেয়েদেরও আপনি চোখে দেখতে পাবেন ; তবে তাদের আপনি দেখতে পাবেন আমারই কুঁড়ে- ঘরে যেখানে আমি তাদের লুকিয়ে রেখেছি। আবারও রানি-মাকে আমি বেওকুফ বানিয়ে দেবো, আপনার বদলে তাঁকে খেতে দেবো নধর একটি হরিণীকেই।'

সে চট ক'রে তাকে নিজের কুঁড়েঘরে নিয়ে এলো, তাকে সেখানেই রেখে এলো—ফিরে পাবার পর ছেলেমেয়েদের বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে। তারপর রানি-মার নৈশভোজের জন্যে হরিণীর মাংস রাঁধবার কাজে লেগে গেলো—রানি-মা তো জানে সে কোনো হরিণী খাচ্ছে না, বরং খাচ্ছে দারুণ তারিয়ে-তারিয়ে খুব স্বাদে ভরা কোনো মাংস, যেমন সে চেটেপুটে খেতো ছোটো রানির মাংস পাতে পড়লে। নিজের নৃশংসতায় সে ভারি খুশি, আর ঠিক ক'রে নিলে রাজা ফিরে আসার পর তাকে সে ব'লে দেবে তার বউ আর তার ছেলেমেয়েকে হালুম-খালুম ব'লে খেয়ে নিয়েছে ঝোপ থেকে বেরিয়ে-আসা রাক্ষুসে কতগুলো নেকড়েই।

একদিন সন্ধেয় রানি-মা যখন কেল্লার প্রাঙ্গণটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি কোনো কচি-কাঁচা বাচ্চা মানুষজনের সুঘ্রাণ তার নাকে আসে, সেই সৌরভ পাবার জন্যেই, সে শুনতে পেলে একতলার একটা ঘর থেকে বাচ্চা বাসরকুমারের গলা ভেসে আসছে। সে দুষ্টুমি করেছিলো ব'লে তার মা তাকে শাসাচ্ছে তাকে ঘা কতক চাবুক লাগাবে ব'লে। সে শুনতে পেলে ছোট্ট ঊষাকেও, যে তার ভাইটিকে মাফ ক'রে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করছে।

রাক্ষুসি তো অমনি চিনে ফেললো রানি আর তার ছেলেমেয়েদের গলার স্বর, আর তাকে এমনভাবে ঠকানো হয়েছে ব'লে তো সে খেপে আগুন, রেগে টং। পরদিন সকালবেলায় সে বাজখাঁই গলায় হেঁকে বললে প্রাঙ্গণটার ঠিক মাঝখানে এক বিশাল গামলা বসিয়ে দেবার জন্যে, আর সেই গামলায় যাতে কিলবিল ক'রে বেড়ায় যত রাজ্যের কোলাব্যাঙ, কেউটে সাপ, গোখরো আর আরো-যত বিষধর সরীসৃপ। আর এই গামলাতেই ছুঁড়ে ফেলা হবে ছেলেমেয়ে শুদ্ধু খোদ রানিকে, বউ-বাচ্চা শুদ্ধু ওই বাবুর্চিকে আর তার খাশ চাকরটিকে। সব্বাইকেই তার হুকুমমাফিক বেঁধে আনা হ'লো, পিঠে তাদের হাতগুলো বাঁধা।

তারা তো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আর জল্লাদেরা তাদের ওই বিশাল গামলাটায় ছুঁড়ে ফেলে দেবার তোড়জোড় করছে, এমন সময় স্বয়ং রাজাবাহাদুর—এত তাড়াতাড়ি তার ফিরে আসার কথা কেউ ভাবেনি—ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা ওই প্রাঙ্গণে এসে হাজির। সে তো ঝড়ের বেগে লড়াইয়ের ময়দান থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। এমন কাণ্ড দেখে তো সে থ, ক্রুদ্ধগলায় সে জানতে চাইলো এমন ভয়ংকর দৃশ্যটার মানে কী। কেউ তাকে কিছু খুলে বলতে সাহস করলে না, কিন্তু ওই রাক্ষুসি ঘটনা এমনভাবে মোড় নিয়েছে দেখে নিজেই সোজা গিয়ে ওই গামলাটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লো, আর চক্ষের নিমেষে, যত হিংস্র ভীষণ জীব সে ওই গামলায় ছেড়ে দিয়েছিলো, তারা তার ইষ্টির তুষ্টি ক'রে ছাড়লো। রাজাবাহাদুর অবিশ্যি একটু দুঃখই পেলে, হাজার হোক ও তো ছিলো তার মা। তবে সে শিগগিরিই তার রূপসী বউ আর মিষ্টিমধুর ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনায় ওই দুঃখ ভুলে গেলো।







ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ

এক-যে ছিলো ছোট্ট একটি মেয়ে, দেখে তাক লেগে যাবার মতো সুন্দরী। তার মা তো তাকে প্রায় পাগলের মতোই ভালোবাসেন, আর তার ঠাম্মা তাকে ভালোবাসেন তার চেয়েও বেশি। দরাজদিল বুড়ি তার জন্যে ছোট্ট এক লাল তাজ বানিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেটা তাকে এমন মানিয়েছিলো যে সব্বাই তাকে ডাকতো ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ ব'লে।

একদিন তার মা কতগুলো কেক সেঁকে বানালেন, আর মেয়েকে বললেন :

'যা তো, গিয়ে দেখে আয় তোর ঠাম্মা এখন কেমন আছেন, কারণ কে যেন বলছিলো তাঁর নাকি শরীর ভালো নেই। গিয়ে ওঁকে কেকটা দিবি, আর এই মাখনের কৌটোটা।'

মেয়েটি, যার মাথায় ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ, তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লো তার ঠাম্মার খোঁজ-খবর নিতে, তিনি তো আবার অন্য-একটা গাঁয়ে থাকেন কিনা। একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো নেকড়েদের কর্তার সঙ্গে, তার তো তাকে দেখেই টুক ক'রে খেয়ে ফেলবার ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু কাছেই কজন কাঠুরে কাঠ কাটছিলো দেখে তার আর ওই দুঃসাহস হ'লো না। সে বরং মেয়েটিকে জিগেস করলে কোথায় যাচ্ছে। বেচারি বাচ্চা মেয়ে তো আর জানে না যে রাস্তায়

হুট ক'রে থেমে গিয়ে কোনো নেকড়ের সঙ্গে কথা বলা ভারি বিপজ্জনক ব্যাপার, সে বললে :

'আমি যাচ্ছি আমার ঠাম্মার কাছে, তাঁর জন্যে নিয়ে যাচ্ছি একটা কেক আর এক কৌটো মাখন—আমার মা পাঠিয়েছেন।'

'উনি কি এখান থেকে দূরে কোথাও থাকেন নাকি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' বললে মেয়ে, যার মাথায় ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ। 'ওই-যে ওই ঝিলটা দেখা যাচ্ছে তার পরেই, গাঁয়ের প্রথম বাড়িটায়।'

'বেশ,' নেকড়ে বাহাদুর বললে, 'আমিও না-হয় গিয়ে তাঁকে দেখে আসি একবার। আমি যাবো এই পথ ধ'রে আর তুমি তো যাবে ওই পথে, তারপর দেখা যাবে দুজনের মধ্যে কে সেখানে আগে গিয়ে পৌঁছুতে পারে।'

সবচেয়ে-সংক্ষিপ্ত পথটা ধ'রেই প্রাণপণে ছুট লাগালে নেকড়ে, আর ছোট্ট মেয়েটি চললো দীর্ঘতম পথটি ধ'রে, রাস্তায় তার ওপর সময় কাটালো বাদাম কুড়িয়ে, প্রজাপতির পেছনে ছুটে, আর বুনো ফুলের ছোটো-ছোটো থোকা জড়ো ক'রে।

নেকড়ে তো একটুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেছে ঠাম্মার বাড়ি। দরজায় টোকা দিলে সে : ঠক-ঠক-ঠক!

'কে ওখানে?'

'তোমার নাতনি গো, সেই-যে মেয়ে যার মাথায় ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ,' মেয়েটির গলার স্বর নকল ক'রে বললে ওই বাহাদুর নেকড়ে। 'আমি তোমার জন্যে মায়ের কাছ থেকে একটা কেক আর এক কৌটো মাখন নিয়ে এসেছি গো।'

ঠাম্মার শরীরটা বেশ কাহিল লাগছিলো, তিনি বিছানাতেই শুয়ে ছিলেন ; ডেকে বললেন :

'ছিটকিনিটায় টান দে, আর হুড়কোটা খুলে নে।'

নেকড়ে ছিটকিনি ধ'রে টান লাগাতেই দরজা খুলে গেলো। সে লাফিয়ে পড়লে বুড়ি ঠাম্মার ওপর আর চক্ষের নিমেষে এক থাবাতেই তাকে খেয়ে সাবাড় ক'রে দিলে, কারণ তিন দিন ধ'রে তার পেটে একটা দানাও পড়েনি। তারপর সে দোর লাগিয়ে দিয়ে ঠাম্মার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো, ওত পেতে রইলো কখন আসে সেই মেয়েটি, যে মাথায় প'রে আছে ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ।

শেষটায় তো মেয়েটি এসে পৌঁছুলো সেখানে, দরজায় টোকা দিলো সে : ঠক-ঠক-ঠক!

'কে রে ওখানে?'

গোড়ায় ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ তো বেশ ভড়কেই গিয়েছিলো নেকড়ের অমন বাজখাঁই গলা শুনে, তারপর তার মনে হ'লো ঠাম্মার নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছে, আর তাই তাঁর গলাটা অমন কেমনতর হ'য়ে গেছে। তাই সে উত্তর দিলে :

'আমি তো তোমার নাতনি গো, ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ। তোমার জন্যে আমি একটা কেক আর ছোট্ট এক কৌটো মাখন নিয়ে এসেছি। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

গলাটাকে একটুখানি মোলায়েম করার চেষ্টা ক'রে নেকড়ে হেঁকে বললে :

'ছিটকিনিটায় টান দে, আর অমনি হুড়কোটা খুলে যাবে।'

ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ ছিটকিনি ধ'রে টান দিলে, আর খিলটা খুলে গিয়ে দরজা খুলে গেলো।

নেকড়ে যেই তাকে আসতে দেখলে, অমনি চাদরের মধ্যে সে নিজেকে ঢেকে ফেললে, বললে :

'কেকটা আর মাখনের কৌটোটা রুটির বাটির মধ্যে রেখে দে, তারপর আয় আমার সঙ্গে বিছানায়

শুবি।'

ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজ তার গায়ের জামাকাপড় খুলে বিছানায় চ'লে এলো, কিন্তু তাঁর রাত-পোশাকে ঠাম্মাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে! তার বেশ অবাকই লাগলো। সে ঠাম্মাকে বললে :

'ঠাম্মা, তোমার ড্যানা দুটো কী বড়ো!'

'বাছা, তোকে বুকে জড়িয়ে ধরতে সুবিধে হবে ব'লেই তো!'

'তোমার ঠ্যাং দুটোও তো মস্ত, ঠাম্মা!

'লম্বা ঠ্যাঙে ভালোভাবে ছোটা যায় যে, বাছা।'

'তোমার কান দুটোই বা কেমন যেন বড়ো-বড়ো, ঠাম্মা!'

'শুনতে তাতে সুবিধেই হয় রে, বাছা!'

'তোমার চোখ দুটোই বা কেমন ড্যাবডেবে, বড়ো, ঠাম্মা!'

'ভালো ক'রে দেখা যায় যে, বাছা!'

'আর তোমার দাঁতগুলোও যে কেমন বড়ো-বড়ো ঠাম্মা!'

'সে তো তোকে খাবো ব'লেই!'

এই ব'লে, ভীষণ পাজি ওই নেকড়ে ছোট্ট লাল ঘোড়সোয়ারি তাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর তাকে খপ ক'রে খেয়ে ফেললো।



নীলদাড়ি চাপদাড়ি

এক-যে ছিলো মহদাশয়, যার ছিলো চমৎকার সব বাড়ি শহরে-গ্রামে। ছিলো সোনার থালা রুপোর থালা; ছিলো বিস্তর আশবাবপত্তর, দামি-দামি মখমলে রেশমে সাজানো ; ছিলো সোনার পাতে মোড়া কোচবাক্স, তাও যে কত! কিন্তু লোকটার কপালটাই বোধহয় খারাপ, তার দাড়ি ছিলো নীল। ওই নীলদাড়ি চাপদাড়ির জন্যে বেচারাকে দেখাতো ভয়ানক বিশ্রী, ভয়ংকর কুচ্ছিত, আর সেই জন্যে যে-মেয়েই তাকে দেখতো, কিশোরীই হোক বা বয়স্কা, দেখবামাত্র তার সামনে থেকে ছুটে পালাতো।

সম্ভ্রান্ত ঘরের এক মহিলা তার কাছাকাছি থাকতেন, তাঁর ছিলো দুই পরমা সুন্দরী কন্যা। তো এই মহদাশয় তাঁর কাছে গিয়ে আরজি জানালে এদেরই একজনকে তার হাতে শুভবিবাহে সঁপে দেয়া হোক, দুজনের মধ্যে কে যে সেইজন হবে তা না-হয় খোদ মাতৃদেবীই স্থির ক'রে দিন। তা দুই মেয়ের মধ্যে একজনও তার ধারে-কাছেও ঘেঁসতে চাইলো না, তারা নিজেদের মধ্যে তাকে নিয়ে প্রায় লোফালুফি খেলতে লাগলো। কিছুতেই তাদের কেউ নীলদাড়ি চাপদাড়িওলা বরকে পছন্দ করছিলো না।

তাদের ব্যাজার হবার আরো-একটা কারণ অবিশ্যি ছিলো—এই মহদাশয় নাকি এর আগেই বেশ কয়েকটি বিয়ে ক'রে বসেছে, আর তাদের সেই আগেকার বউদের যে কী হয়েছে এ-তল্লাটে ও-তল্লাটে কেউই তা জানে না।

তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্যে, নীলদাড়ি দুই বোনকে নেমন্তন্ন ক'রে বসলো, তার কোনো-একটা বাগানঘেরা সুন্দর বাড়িতে গিয়ে হপ্তাখানেক কাটিয়ে আসতে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মাও সঙ্গে যাবেন, আর সঙ্গে না-হয় যাবে তাদের তিন-চারজন প্রিয় বান্ধবী, পাড়ার কয়েকজন যুবকও সঙ্গে যেতে পারে। তো একটা সপ্তাহ যেন একটানা অবিরাম একটা আমোদ-প্রমোদের মহোৎসবেই কেটে গেলো। বেশ হই-হই ক'রে যাওয়া হ'লো শিকারে, রই-রই করে যাওয়া হ'লো মাছ ধরতে। বসলো কত ভোজসভা, নাচের আসর, নৈশভোজ। রাত্তিরেতে তো কারুই ঘুমোতে যেতে ইচ্ছে করে না, সারারাত তারা কাটিয়ে দেয় রঙ্গতামাশা, হাসি-ঠাট্টা ক'রে। এক কথায়, ব্যাপারটা এমনই জমজমাট সফল হ'লো যে ছোটো মেয়েটি ভাবতে শুরু ক'রে দিলে যে, তাদের আমন্ত্রণকর্তার চাপদাড়ি সত্যি-সত্যি তেমন নীল নয় মোটেই, তাছাড়া মানুষটা বেশ দিলদরিয়া। যেই তারা শহরে ফিরে এলো, বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেলো।

মাসখানেক বাদে, নীলদাড়ি চাপদাড়ি তার বউকে বললে যে তাকে একটা বিশেষ কাজে অন্তত হপ্তা ছয়েকের জন্যে বাইরে যেতে হবে। সে যখন থাকবে না, বউ যেন আদৌ কিছু না-ভাবে, বরং খোলা মেজাজেই যেন সময়টা কাটিয়ে দেয়, ইচ্ছে করলে বন্ধু-বান্ধবকেও নেমন্তন্ন ক'রে আনতে পারে।

'এই-যে,' সে বললে, 'দুটো মস্ত ঘরের চাবি রইলো, সেখানে সব দামি-দামি আশবাব আছে, এই চাবিগুলো সোনা-রুপোর থালা-বাসনের ভাঁড়ারের। হররোজ তো আর সে-সব ব্যবহার হয় না ; এই চাবিগুলো আমার সব সিন্দুকের, সেখানেই আছে আমার যত সোনা-রুপো, হিরে-জহরৎ ; আর এইটে হ'লো সবখোল চাবি অর্থাৎ চাবির রাজা। এই চাবি দিয়ে সব ঘরই খোলা যায়। আর এই যে ছোট্ট চাবিটা, এটা একতলার ওই লম্বা গ্যালারির শেষটায় যে খুদে ঘরটা আছে, তার চাবি। সেই ঘরে ঢুকতে আমি কিন্তু তোমায় পই-পই ক'রে বারণ ক'রে যাচ্ছি। আমি তোমায় এখনই হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছি যে ভুলেও, দৈবাৎ, যদি কখনও ওই ঘর খুলে তুমি ভেতরে ঢোকো, আমার রাগের কিন্তু কোনো শেষ থাকবে না, আমি কিন্তু ভয়ংকর চ'টে যাবো।'

মেয়েটি কথা দিলে যে সব কথাই সে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে, তারপর মেয়েটিকে আদর ক'রে, নীলদাড়ি চাপদাড়ি গিয়ে উঠে পড়লো তার কোচবাক্সে, তার ওই বিশেষ জরুরি কাজে রওনা হ'য়ে গেলো।

তার সব বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শি কিন্তু নববধূর কাছে নেমন্তন্ন পাবার জন্যে আদপেই সবুর করেনি। তারা তো সবাই মুখিয়েই ছিলো কখন গিয়ে তারা এক-এক ক'রে দেখতে পাবে তার বাড়ির সব চমৎকার জিনিশ; যখন তার স্বামী বাড়ি ছিলো তখন তারা তার কাছে ঘেঁসবারই সাহস পায়নি, কারণ তারা সব্বাই তার ওই নীলদাড়ি চাপদাড়িকে বেজায় ভয় পেতো। এখন তারা দঙ্গল বেঁধে এলো, দেখলো এই শোবার ঘর থেকে ওই শয়নঘর, দেখলো দেরাজে কুলুঙ্গিতে কী-সব দামি-দামি জিনিশ আছে। ঢুকলো গিয়ে বৈঠকখানায়, হলঘরে, সাজপোশাক পরার ঘরে, আর যেখানেই গিয়ে ঢোকে, সেই শেষ ঘরটাকেই তাদের আগেকার সব ঘরের চাইতেও দারুণ চমৎকার ঠেকে। তারপরে তারা গেলো সেইসব ঘরে যেখানে দামি-দামি সব আশবাবপত্র ঠাশা, হাঁ ক'রে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো কত সব চমৎকার চিত্রবিচিত্র নক্‌শাকাটা ঢাকনা, পর্দা, খাটপালঙ্কগুলোর বাহারই বা কিছু কম নাকি, তারপর ওই-যে সোফাগুলো, দেরাজগুলো, সব আলমারি, ছোটো-বড়ো সব টেবিল, আর আয়নাগুলো! দ্যাখো-দ্যাখো, কত রকমের আয়না, সেইসব আয়না, আরশিমুকুর, কিনা তাদেরই পা থেকে মাথা অব্দি ফিরে-ফিরে দেখাচ্ছে, আর তাদের দামি-সব কাঠামোর কোনো-কোনোটায় ঢালু হ'য়ে অবতলে নেমে এসেছে কাচ, কতগুলো আবার রুপোর পাতে মোড়া, সোনা-রুপোর কারুকাজ করা, উঃফ্, এমন চমৎকার জিনিশ তো তারা কস্মিনকালেও

দ্যাখেনি! বন্ধুর এই খুশ্ কিসমত দেখে তাদের এমনই তাক লেগে গিয়েছে যে, তারা তাদের চমক বা হিংসে কিছুই প্রায় চেপে রাখতে পারে না। এদিকে মেয়েটি নিজে কিন্তু এত সবকিছু দেখে মোটেই খুশি হয়নি, সে তো অধীর হ'য়ে আছে কখন যাবে একতলার সেই ছোটো ঘরটায়, গিয়ে দেখবে সেখানে কী আছে, যার জন্যে এত ঢাক-ঢাক গুড়গুড়, এত হম্বিতম্বি তাকে শুনতে হয়েছে।

তার কৌতূহল শেষটায় এমনি তীব্র হ'য়ে উঠলো যে, সে একবারও ভাবেওনি তার অতিথিদের এভাবে ছেড়ে চ'লে-যাওয়া ঠিক হবে কিনা ; সে সটান একটা লুকোনো সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচে নেমে গেলো, এতই তাড়াতাড়ি চলছিলো যে শেষটায় সে প্রায় হোঁচট খেয়ে প'ড়ে নিজের ঘাড়টাই প্রায় ভেঙে ফ্যালে আর-কি! ছোটো ঘরটায় দরজার কাছে পৌঁছে অবশ্য সে এক ঝলক থমকে দাঁড়ালে, তার তখন মনে প'ড়ে গেছে তার স্বামীর পই-পই নিষেধ, মনে হচ্ছে কিছু-একটা নিশ্চয়ই বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘ'টে যাবে এক্ষুনি, যদি সে এখন চাপদাড়ি নীলদাড়ির হুকুমটা ঠিকঠাক তামিল না-করে। কিন্তু কৌতূহলটা উগ্র, ঔৎসুক্যটা প্রগাঢ়। তো সে বার ক'রে নিলে খুদে চাবিটা, দরজার তালা খুলে ফেললে কাঁপা-কাঁপা ভীরু অথচ ব্যগ্র হাতে।

গোড়ায় সে তো কিছুই দেখতে পেলে না, কারণ জানলাগুলো সব খড়খড়ি নামানো, বন্ধ। তবে কয়েক লহমা কেটে যাবার পরেই ওই আবছায়ায় তার চোখ স'য়ে গেলো, সে দেখতে পেলে মেঝেটা চাপ-চাপ শুকনো রক্তে ভ'রে আছে, আর শুকনো জমাট রক্তের মধ্যে ছায়া পড়েছে বেশ কয়েকজন মেয়ের, তারা সব দেয়াল থেকে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। এরা হচ্ছে নীলদাড়ি চাপদাড়ির আগেকার সব বউয়েরা, সেই যাদের সে এককালে বিয়ে করেছিলো আর যারা কেমন রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হ'য়ে গিয়েছিলো। ভয়ে, আতঙ্কে সে প্রায় মূর্ছাই যায় বুঝি তখন। আর ঘরটার সেই খুদে চাবিটা যেটা সে এই মাত্র তালার গা থেকে বার ক'রে নিয়েছিলো সেইটে তার হাত ফসকে প'ড়ে গেলো মেঝেয়।

শেষটায় যখন সে নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে, সে ওই চাবিটা তুলে দরজাটাকে ফের চাবি বন্ধ ক'রে, সোজা প্রায় ছুটেই উঠে এলো নিজের ঘরে, অমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে সামলে-শুমলে নিতে। কিন্তু ওই দৃশ্য দেখে সে এতটাই বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলো যে, সে কিছুতেই আর তাকে ভুলতে পারছিলো না।

ছোটো ঘরটার চাবির গায়ে রক্তের ছাপ লেগে আছে দেখে সে দু-একবার জোরে-জোরে ঘ'সে সেটার গা থেকে রক্তের দাগ তুলে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ওই রক্তের দাগ উধাও হ'লে তো! সে চাবিটাকে ধুলো, এমনকী তামা আর বালি ঘ'সে সেটাকে সাফ করবারও চেষ্টা করলে, অথচ রক্ত কিন্তু তার গায়ে তেমনি লেপটে আছে ; সে তো আর জানতো না যে এটা হ'লো কুহক চাবি, জাদু দিয়ে ঘেরা। এটাকে পুরোপুরি সাফ করার কোনো উপায়ই নেই। যেই সে চাবিটার একধার মেজে-ঘ'সে সাফ ক'রে দেয়, অমনি অন্য ধারটায় আবার এসে হাজির হয় রক্তের ছোপ।

সেইদিনই সন্ধেবেলায় নীলদাড়ি চাপদাড়ি তার কাজ-কারবার সাঙ্গ ক'রে বাড়ি ফিরে এলো। তার এত চটপট ফিরে আসার কৈফিয়ৎ হিশেবে সে জানালে যে, রাস্তাতেই তার কাছে কতগুলো চিঠি এসে পৌঁছেছিলো, তাতে নাকি তাকে জানানো হয়েছিলো যে এরই মধ্যে তার সব কাজকর্ম ভালোভাবে সারা হ'য়ে গেছে। তার বউ যারপরনাই চেষ্টা করলে যাতে সে এমন ভাব দেখাতে পারে যে তার অমন চটপট ফিরে আসায় সে কতই না খুশি হয়েছে।

পরদিন নীলদাড়ি চাপদাড়ি তার বউকে বললে চাবিগুলো তাকে ফিরিয়ে দিতে। চাবির গোছা ফিরিয়ে দিলে বটে, তবে তার হাত এমনভাবে কাঁপছিলো যে তার স্বামী তক্ষুনি আঁচ ক'রে নিতে পারলে কী হয়েছে।

'ব্যাপারটা কী, বলো তো,' নীলদাড়ি জিগেস করলে, 'ছোট্ট ঘরটার চাবিটা তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না?'

মেয়েটি বললে, 'সেটা নিশ্চয়ই ভুল ক'রে ওপরে আমার ঘরে টেবিলে রেখে এসেছি।'

নীলদাড়ি বললে, 'চটপট চাবিটা আমায় ফিরিয়ে দিতে যেন ভুল কোরো না।'

বেশ বার কয়েক গড়িমসি করবার শেষটায় মেয়েটি বাধ্যই হ'লো চাবিটা তার কাছে নিয়ে যেতে। ভুরু কুঁচকে সেটাকে ভালো ক'রে দেখে-টেখে নিয়ে নীলদাড়ি তাকে বললে : 'আরে! চাবিটার গায়ে রক্ত লেগে আছে কেন?'

বেচারি মেয়ে প্রায় মড়ার মতো ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। 'আমার তো কোনো আন্দাজই নেই।'

'অ্যাঁ! তোমার কোনো আন্দাজই নেই!' তড়পেই উঠলো নীলদাড়ি। 'কিন্তু আমার আছে। তুমি ওই ছোট্ট ঘরটায় ঢোকবার চেষ্টা করেছিলে! ঠিক আছে, মহোদয়া, আপনি তবে ওই ঘরটার মধ্যে গিয়েই ঢুকবেন! ওখানে যে-সব ঝোলানো শরীর দেখেছো, তাদের সঙ্গেই গিয়ে এবার তোমায় ওখানে ঝুলতে হবে।'

মেয়েটি নিজেকে তার বরের পায়ে প্রায় আছড়েই ফেললে, কেঁদে কঁকিয়ে সারা। তার কথা সে শোনেনি ব'লে এবারকার মতো যেন মাফ ক'রে দেয়, এই নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কাকুতি-মিনতিই যে করলে। মেয়েটির অমন অঢেল রূপ, তার অমন দুঃখকাতর কান্নাকাটি এমনকী একটা পাথরকেও হয়তো গলিয়ে দিতো, কিন্তু নীলদাড়ির বুকটা ছিলো যে-কোনো পাষাণের চেয়েও কঠিন।

'আপনাকে মরতেই হবে, মহোদয়া,' নীলদাড়ি বললে, 'এবং এক্ষুনি!'

'তাহ'লে, আমাকে যদি মরতেই হয়,' চোখ থেকে অঝোর ধারে অশ্রু ঝরছে, ঝাপসা সজল চোখে মেয়েটি বললে, 'অন্তত একটু সময় দাও, যাতে আমি আমার শেষ প্রার্থনাটা সাঙ্গ ক'রে যেতে পারি।'

'আমি তোমাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি,' নীলদাড়ি বললে, 'কিন্তু তার চেয়ে এক মুহূর্তও বেশি নয়।'

একা হওয়া মাত্র মেয়েটি তার দিদিকে ডেকে পাঠালে, তাকে বললে, 'অ্যান, দিদি আমার,' তার দিদির নাম অ্যান। 'মিনারটার ওপরের পাঁচিলের কাছে গিয়ে দ্যাখ তো আমাদের ভাইগুলোকে কোথাও দেখতে পাস কিনা। ওরা আমায় কথা দিয়েছিলো আজ ওরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আর, যদি তুই ওদের দেখতে পাস, তবে হাত নেড়ে ওদের যত-তাড়াতাড়ি-সম্ভব চ'লে আসতে ডাক দিবি।'

দিদি অ্যান মিনারের ওপরকার নিচু পাঁচিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, আর একটু পরে-পরেই তার বোন তাকে ডেকে শুধোতে লাগলো—

'অ্যান! অ্যান! কী দেখতে পাচ্ছিস তুই!'

আর দিদি অ্যান উত্তরে জানায়, 'শুধু দেখছি ঘাস আরো সবুজ হ'য়ে গেছে আর তাদের ওপর ঝিকমিক করছে রোদ্দুর।'

এদিকে নীলদাড়ি ইয়া তাগড়াই এক তরোয়াল হাতে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলো, 'এক্ষুনি নিচে নেমে এসো। না কি আমিই এবার ওপরে উঠে আসবো?'

'আর কটা মুহূর্ত শুধু, দোহাই,' বললে তার বউ, তারপর আস্তে নরম ক'রে ডাক দিলে, 'অ্যান! অ্যান! এখন, বল তো, কী তোর চোখে পড়ছে?'

তার দিদি অ্যান উত্তর দিলে, 'শুধু ঘাসগুলোই আরো সবুজ হ'য়ে যাচ্ছে আর তাদের ওপর ঝিকিমিকি খেলছে রোদ।'

'নিচে নেমে এসো, এক্ষুনি,' তড়পে বললে নীলদাড়ি, 'না-হ'লে আমি নিজেই কিন্তু ওপরে উঠে আসবো!'

'আসছি তো,' বললে তার বউ, তারপর দিদিকে ডাক দিলে, 'অ্যান! অ্যান! কী দেখতে পাচ্ছিস তুই?'

'দেখছি যে,' দিদি অ্যান উত্তর দিল, 'হু-ই দূর থেকে এক মস্ত মেঘ ধেয়ে আসছে।'

'আমার ভাইয়েরা?'

'হায়-রে, বোন, হায়! এ তো এক দঙ্গল ভেড়া!'

'তুমি নিচে নামবে কি না,' নীলদাড়ির গর্জন।

'শুধু আরেকটা মুহূর্ত,' বললে তার বউ, তারপর সে ডাক দিলে, 'অ্যান! অ্যানদিদি! কী দেখতে পাচ্ছিস রে তুই?'

'দেখছি যে', অ্যান বললে উত্তরে, 'ওদিক থেকে দুজন ঘোড়সোয়ার আসছে। তবে তারা কিন্তু এখনও বড্ড দূরে।'

'ঈশ্বরের জয় হোক!' এক লহমা বাদেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এরা তো আমাদের ভাইয়েরাই। তারা যাতে তাড়াতাড়ি আসে, সেইজন্যে আমি প্রাণপণে হাত নেড়ে তাদের ডেকে যাচ্ছি।'

নীলদাড়ি চাপদাড়ি এত জোরে তার তর্জন-গর্জন শুরু ক'রে দিলে যে আস্ত বাড়িটাই থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। তার বউ বেচারি নিচে উঠোনে এসে দাঁড়ালে, এসেই তার পায়ে নিজেকে আছড়ে ফেললো, কাঁদছে তো কাঁদছেই, বেশভূষা বিস্রস্ত, চোখে কেবল জল।

'কোনো ফায়দা নেই,' নীলদাড়ির হুঙ্কার, 'মরতে তোমাকে হবেই!' তারপরে এক হাতে তার চুলের মুঠি ধ'রে, আর অন্যহাতে তার ওই মস্ত তলোয়ারটা বাগিয়ে ধ'রে, তার মুণ্ডুটাই ধড় থেকে আলাদা ক'রে দিতে চাচ্ছিলো নীলদাড়ি, কাঁচুমাচু মেয়েটি, তার দিকে মুখ তুলে মিনতির ভঙ্গিতে তাকিয়ে, তার কাছে আরো-একটা মুহূর্ত ভিক্ষে চাইলে—'মরবার আগে একটু সময় চাই, সব ভাবনাচিন্তা সামলে নেবার জন্যে।'

'না, না!' নীলদাড়ির হুঙ্কার। 'ঈশ্বরের কাছে তোমাকে সঁপে দেবো, এক্ষুনি,' আর ফের তার হাত তুলে...

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় প্রবল ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি, এতই জোরে যে, নীলদাড়ি থমকে দাঁড়ালে। খট্‌খট্‌ দড়াম ক'রে দরজা খুলে গেলো, আর তক্ষুনি উঁচনো তলোয়ার হাতে নীলদাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে এলো দুজন ঘোড়সোয়ার।

এরা যে তার বউয়েরই ভাই, নীলদাড়ি সেটা বুঝতে পেরেছে, এদের একজন খোদ রাজমশাইয়ের ঘোড়সোয়ার সেনা, অন্যজন সেনাদলেরই বন্দুকধারী গোলন্দাজ। তাদের দেখেই, চম্পট দেবে ব'লে নীলদাড়ি তড়াক ক'রে পেছন ফিরলো। কিন্তু এরা তখন তার এতই কাছে এসে পড়েছে যে বাড়ির মধ্যে ঢোকবার জন্যে সিঁড়ির কাছে যাবার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একসঙ্গেই দুই ভাই তাদের তলোয়ারে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দিলে তাকে, তার বউ বেচারি তখন তার স্বামীর চেয়ে বোধহয় মাত্র-একটুখানি বেশি জ্যান্ত, তার গায়ে তখন এটুকু শক্তিও আর নেই যে এগিয়ে গিয়ে তার ভাইদের বুকে জড়িয়ে ধরে।

পরে জানা গেলো যে নীলদাড়ি চাপদাড়ির কোনো বৈধ ওয়ারিশানই নেই, সেইজন্যে তার সম্পত্তি এবার তার বউয়েরই দখলে চ'লে এলো। সে তার বেশ খানিকটা অংশ দিয়ে দিলে তার দিদি অ্যানের বিয়ের জন্যে। এক বনেদি বংশের ছেলের সঙ্গে অ্যানের অনেকদিন থেকেই ভাব ছিলো, সে-ই হ'লো গিয়ে এই বিয়ের সৎপাত্র। সম্পত্তির আরেকটা বড়ো অংশ সে দিয়ে ছিলো তার দুই ভাইকে যাতে রাজার সেনাবাহিনীতে তার ভাইয়েরা কাপ্তেনের পদের দখলনামা কিনে নিতে পারে। সম্পত্তির বাকি অংশটি দিয়ে সে এবার নিজে বিয়ে করলে চমৎকার এক সহৃদয় সজ্জনকে, যে কিছুদিনের মধ্যেই তাকে ভুলিয়ে দিলে নীলদাড়ি চাপদাড়ির সঙ্গে তার কী-রকম সর্বনাশা দিন কেটেছিলো।



বিল্লি উস্তাদ

এক-যে ছিলো পেষাইকলের মালিক, সে হঠাৎ একদিন দুম ক'রে ম'রে গেলো ; ম'রে যাবার আগে তার যাবতীয় সম্পত্তি রেখে গেলো তার তিন ছেলের জন্যে—তার পেষাইকল, তার গাধাটা আর তার বিল্লিকে। সম্পত্তি খুব সহজেই ভাগাভাগি হ'য়ে গেলো, তার জন্যে না-ডাকতে হ'লো উকিল মোক্তার, না-ডাকতে হ'লো আদালতের প্রতিনিধি। এই যৎসামান্য সম্বল তো তারা চট ক'রেই গবগব ক'রে খেয়ে ফেলতো। বড়ো ছেলে পেলে পেষাইকল, মেজো ছেলে গাধাটাকে, আর ছোটোজন পেলে কুললে ওই বিল্লিটাকে।

তো, ছোটোকে কি আর সান্ত্বনা দিয়ে সামলানো যায়—এই নাম-কা-ওয়াস্তে সম্পত্তিটুকু পেয়ে তার দুঃখ দ্যাখে কে।

'আমার দাদারা তো,' সে বললে, 'দুজনে এককাট্টা হ'য়ে গেলে দিব্যি ভালোভাবেই রোজগার ক'রে বাঁচতে পারবে। কিন্তু আমি আমার এই বেড়ালটাকে গিলে ফেলবার পর তার চামড়া দিয়ে যখন একজোড়া দস্তানা বানিয়ে নেবো তখন তো আমায় নির্ঘাৎ উপোস ক'রে মরতে হবে।'

বিল্লি উস্তাদ কিন্তু কথাগুলো ঠিকই শুনেছিলো, তবে এমন ভঙ্গি করলে যে এ-সব বুলি তার যেন

কানেই যায়নি, বরং বেশ শান্ত ধীরস্থির গলায় বললে :

'মিথ্যে ভাববেন না, মালিক। আমায় শুধু একটা বস্তা দিন আর এক জোড়া জুতো বানিয়ে দিন যাতে আমি ওই বৈঁচি ঝোপটোপের মধ্যে যেতে পারি—তাহ'লেই দেখতে পাবেন নিজেকে আপনি যতটা দীনহীন কাঙাল ব'লে ভাবছেন আপনি মোটেই কিন্তু তা নন।'

তো, বেড়ালের মালিকের যদিও এই পরামর্শের ওপর আদপেই কোনো আস্থা ছিলো না, তবে সে কিন্তু আগেই দেখেছিলো চুহা আর নেংটি ইঁদুরটিদুর ধরায় সে কেমন আশ্চর্য সব কারদানি দেখায়, পা তলায় মুণ্ডু ওপরে ঝুলে থাকতে পারে, কিংবা আটা রাখার ওই জালাটার পাশে মেঝেয় নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু এমনভাবে শুয়ে থাকতে পারে যেন সে ম'রেই গেছে! সে তখন ভাবলে দেখাই যাক না চেষ্টা ক'রে, বিল্লি উস্তাদ কতটা কী করতে পারে।

তো, বেড়াল যখন যা-যা চেয়েছিলো সব পেয়ে গেলো, সে দিব্যি চৌকশ কেতায় পায়ে এঁটে নিলে বুটজুতোর বকলস, কাঁধের ওপর ঝোলালে বস্তাটাকে, তার দাড়িটাড়িগুলো সে চারপায়ে চুমরে ধ'রেই সামলালে, তারপর সে সোজা চ'লে গেলো বনের মধ্যে, যেখানে ছিলো খরগোশদের এক মস্ত আড্ডা।

সে তার বস্তার মধ্যে পুরলে কিছু তুষ আর ভুশি আর শেয়ালকাঁটার বীজ, আর মাটিতে টান-টান হ'য়ে চিৎপাত শুয়ে-শুয়ে এমন ভান করলে যেন সে ম'রেই গিয়েছে, আর শুয়ে-শুয়ে ওৎ পেতে রইলো কয়েকজন খরগোশের ছানার জন্যে—তারা তো বাচ্চা খরগোশ, তারা কী ক'রে জানবে পৃথিবীতে বজ্জাতির কতরকম দুষ্টু বুদ্ধি আছে, তারা সোজা এসে ঢুকে পড়বে বস্তায়, দেখতে চাইবে এর মধ্যে সে-কোন গুপ্তধন আছে।

তো বিল্লি উস্তাদ শুয়েছে কি শোয়নি, তার কৌশল কিন্তু দিব্যি কাজে খাটে গেলো। খরগোশের এক হাঁদা ছানা বস্তার মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে পড়লো, আর অমনি বিল্লি উস্তাদ মুখটা দড়ি দিয়ে আঁটো ক'রে বেঁধে, তাকে পাকড়ে ধ'রে, কোনো দয়াময়া না-দেখিয়েই মেরে ফেললে।

নিজের এই কৃতিত্বে দেমাকে তো তার বুক ফুলেই গেছে ততক্ষণে, সে সোজা এবার চ'লে গেলো রাজবাড়িতে। গিয়ে বললে সে খোদ রাজার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাকে পরম ভট্টারক রাজামশাইয়ের কামরায় নিয়ে যাওয়া হ'লো, গিয়েই সে মাটিতে ঝুঁকে প'ড়ে লম্বা একটা কুর্নিশ ক'রে বললে :

'রাজাধিরাজ, আমার মালিক কারাবাস-এর মার্কি (এই নামটাই দিয়েছিলো সে তার মালিককে) এই খরগোশটাকে তাঁর হ'য়ে আপনার খিদমতে নিবেদন করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'তোমার প্রভুকে বোলো,' রাজামশাই বললেন, 'আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের তিনি বেজায় তুষ্ট করেছেন।'

আরেকদিন বিল্লি উস্তাদ গেলো এক ভুট্টা খেতে, বস্তার মুখটা খুলে রেখে সে পাশেই লুকিয়ে-লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, আর একটু বাদেই উড়ে এলো এক জোড়া পাখি, আর সোজা ঢুকে পড়লো বস্তায়, আর সে বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে অমনি তাদের পাকড়ে নিলে। খরগোশের ছানার বেলায় সে যেমন করেছিলো এবারও সে তা-ই করলে, পাখি দুটোকে নিয়ে গিয়ে সে রাখলে খোদ রাজাধিরাজের প্রণিপাতে। রাজামশাই উপহার পেয়ে খুব খুশি, তাকে কিছু টাকা বখশিশ দিয়ে বললেন, 'নাও, এ দিয়ে তুমি জলখাবার খেয়ো।'

বিল্লি উস্তাদ এভাবেই টানা দু-তিন মাস ধ'রে প্রায়ই গিয়ে রাজাকে বনের পশুপক্ষী ধ'রে-ধ'রে উপহার দিতে লাগলো, 'আমার মালিকের মৃগয়াভূমির জীব এরা, তিনি আপনার বিনোদনের জন্যে পাঠিয়েছেন।'

একদিন সে শুনতে গেলে রাজাধিরাজ নাকি তাঁর মেয়েকে নিয়ে নদীর ধার দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে বেড়াতে যাবেন—বিল্লি উস্তাদ তার মালিককে এসে বললে, 'ইনি, জেনে রাখুন, পৃথিবীর সবচেয়ে-সুন্দরী রাজকন্যা।' এই ভণিতা ক'রে সে তার মালিককে বললে :

'আপনি যদি আমার পরামর্শ শোনেন তো আপনার কপাল খুলে যাবে। আপনাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে—নদীতে ঠিক যে-জায়গাটা দেখাবো সেখানে আপনি নাইবেন, ব্বাস, বাদবাকি যা-কিছু তারপর আমি দেখবো।'

বেড়াল যা বলেছিলো মার্কি দ্য কারাবাস ঠিক তা-ই করলে, সে অবশ্যি জানেও না এ থেকে শেষটায় কী ফায়দা হবে। যখন সে নদীতে স্নান করছে, রাজার গাড়ি এসে হাজির, আর তা-ই দেখে বেড়াল গলা ছেড়ে যত জোরে পারে চ্যাঁচাতে লাগলো :

'বাঁচাও! বাঁচাও! আমার প্রভু কারাবাস-এর মার্কি জলে ডুবে যাচ্ছেন।'

রাজা তাঁর ঘোড়ার গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন কী ব্যাপার—দেখতে পেলেন যে-বেড়াল তাঁর কাছে অ্যাদ্দিন ধ'রে এত-সব পশুপক্ষী এনে দিয়েছে সে-ই এখানে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। তিনি তক্ষুনি সেপাইশান্ত্রীদের হুকুম দিলেন গিয়ে যেন এক্ষুনি মার্কি দ্য কারাবাসকে জল থেকে উদ্ধার করে।

বেচারা মার্কিকে যখন জল থেকে টেনে তোলা হচ্ছে, বিল্লি উস্তাদ ঘোড়ার গাড়ির কাছে এসে রাজাকে বললে তার প্রভু স্নান করবার জন্যে জলে নামতেই কোত্থেকে কতগুলো চোর-বাঁটপাড় এসে তার জামাকাপড়টাপড় নিয়ে চম্পট দিয়েছে, 'চোর! চোর!' ব'লে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচালেও কিছু হয়নি। বিল্লি উস্তাদ অবশ্য আসলে সে-সব আগেই একটা মস্ত পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো।

রাজা তক্ষুনি তাঁর পোশাকবরদারদের হুকুম দিলেন এক্ষুনি গিয়ে মার্কি দ্য কারাবাসের জন্যে তাঁর পোশাকখানা থেকে সবচেয়ে সুন্দর আর দামি পোশাকআশাক নিয়ে আসতে। রাজাধিরাজ তো ততক্ষণে তাঁর প্রতি স্বয়ং দয়ার অবতারের ভঙ্গিতে আবির্ভূত হয়েছেন, যেহেতু ওই যে-সব জরি বসানো সুন্দর-সুন্দর দামি পোশাক এনে দেয়া হয়েছে, তাতে মার্কি দ্য কারাবাসের রূপ যেন খোলতাই হ'য়ে ফেটে পড়েছে। তো ছোটো ছেলে সত্যি-সত্যি স্বাস্থ্যবান আর দেখতে খুব ভালো ছিলো—রাজকন্যা তো তক্ষুনি তাকে দেখে খুব পছন্দ ক'রে ফেললে, আর যতক্ষণ সে রাজকন্যার দিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গেই বেজায় তারিফ করার ভঙ্গিতে তাকিয়েছে—চোখ কি আর সহজে ফেরাতে পারে—রাজকন্যা তো তার প্রেমে একেবারে পাগলই হ'য়ে গিয়েছে।

রাজাধিরাজ খুব জোর দিয়েই তাকে বললেন সটান কোচবাক্সে উঠে প'ড়ে তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে। নিজের বুদ্ধিটা এমন চমৎকার কাজে খেটে গেলো দেখে বিল্লি উস্তাদ গাড়ির ঢের আগে ছুটে গিয়ে দেখতে পেলে জনাকয়েক চাষী একটা জলাভূমিতে ঘাস কাটছে, পরে ফসল রুইবে ব'লে।

'ওহে ঘেসুড়েরা,' সে বললে, 'তোমরা যদি রাজাকে না-বলো যে তোমরা যে-জমির ঘাস কাটছো তার মালিক খোদ মার্কি দ্য কারাবাস তো তোমাদের সব কটাকেই আমি কুচি-কুচি ক'রে কেটে ফেলবার ব্যবস্থা করবো।'

রাজাধিরাজ তাদের যথাসময়ে জিগেস করতে ভোলেননি এ কার জমির ঘাস তারা কাটছে।

বিল্লি উস্তাদের হুমকিতে তারা তখন প্রায় ভির্মি যেতে বসেছিলো, তারা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে: 'এ-জমি আমাদের প্রভু মার্কি দ্য কারাবাসের।'

রাজা তখন মার্কি দ্য কারাবাসকে বললেন : 'বাঃ, তোমার জমি তো খুব ভালো।'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন, পরম ভট্টারক,' মার্কি উত্তর দিলেন, 'প্রতি বছর এখানে খুব ভালো ফসল পাওয়া যায়।'

বিল্লি উস্তাদ ততক্ষণে আরো দৌড়ে এসেছে, দেখতে পেয়েছে ক-জন চাষী ফসল কাটছে। সে তাদের বললে :

'ওহে ফসল কাটিয়েরা, তোমরা যদি রাজাকে না-বলো যে এই ভুট্টা খেত আমার প্রভু খোদ মার্কি দ্য কারাবাসের, তো আমি তোমাদের সব কটাকে কুচি-কুচি ক'রে কেটে ফেলবার ব্যবস্থা করবো।'

পরের মুহূর্তেই রাজার কোচবাক্স সেখানে এসে হাজির। রাজা যেই জিগেস করেছেন এই বিশাল ভুট্টা খেতের মালিক কে, অমনি তারা সবাই বললে : 'এই জমি খোদ মার্কি দ্য কারাবাসের,' আর শুনেই রাজা আবার মার্কিকে এত ভালো ভুট্টা খেতের জন্যে তারিফ করলেন। বিল্লি উস্তাদ ততক্ষণে লাফিয়ে কোচবাক্সের আগে-আগে ছুটতে লেগেছে। আর পথে তার যাদেরই সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের সবাইকেই শাসিয়ে ব'লে দিয়েছে রাজাকে তারা যেন ব'লে দেয় এই বিশাল জমিজিরেত সবই মার্কি দ্য কারাবাসের সম্পত্তি।

শেষটায় বিল্লি উস্তাদ গিয়ে পৌঁছুলো চমৎকার এক কেল্লায়, তার মালিক এমনই এক রগচটা বদমেজাজি লোক যে সব্বাই তাকে বলে খোক্কস। সে অবিশ্যি খোক্কস কুলে সবচেয়ে ধনী, কারণ এই-যে জোতজমার মধ্য দিয়ে তারা এসেছে তাদের সমস্তটারই মালিক সে। বিল্লি উস্তাদ অবিশ্যি গোড়াতেই জেনে নিলে এই খোক্কস আসলে কে এবং একে কী ক'রে সামলানো যায়, শেষটায় বললে সে গিয়ে খোদ খোক্কসের সঙ্গেই দেখা করতে চায়—এত বড়ো নামজাদা একজন খোক্কসের কেল্লার কাছ দিয়ে যাচ্ছে, তাকে তিনবার সেলাম না-ঠুকে এ-তল্লাট দিয়ে সে যায় কী ক'রে।

খোক্কস, যতটা তার পক্ষে সম্ভব, ভদ্রভাবেই তার সঙ্গে দেখা করলে, বসতে বললে।

'আমি শুনেছি,' বিল্লি উস্তাদ কইলে, 'আপনি নাকি ইচ্ছেমতো যে-কোনো প্রাণীর রূপ ধরতে পারেন, যেমন ধরুন খোদ পশুরাজ সিংহই হ'য়ে উঠতে পারেন, নয়তো কোনো মাতঙ্গবীর?'

খোক্কস বেশ বিচ্ছিরি গলা ক'রেই বললে, 'হ্যাঁ, তা পারি বটে। আর তোমাকে দেখাবার জন্যে—এই দ্যাখো—এক্ষুনি আমি একটা সিংহ হ'য়ে যাচ্ছি।'

সামনে খোদ সিংহমশাইকে দেখে বিল্লি উস্তাদ এমনি আঁৎকে উঠলো যে সে তড়াং ক'রে লাফিয়ে ছাতে উঠে গেলো, যথেষ্টই মুশকিল ক'রে, বিপদ জেনে, কারণ তার বুটজুতো ঠিক ছাতের টালির ওপর চলাফেরা করার মতো ছিলো না।

কিছুক্ষণ বাদে বেড়াল দেখতে গেলে খোক্কস আবার খোক্কস মূর্তিই ধারণ ক'রে ফেলেছে, তো সে বেশ কসরৎ ক'রে নিচে নেমে এলো, বললে, সত্যি সিংহ দেখে সে যে কী ভয়ই পেয়েছিলো।

'আমি অবিশ্যি শুনেছি,' বিল্লি বললে, 'আপনি নাকি খুদে-খুদে জীবদের চেহারাও ধরতে পারেন, যেমন ধরুন কোনো বেড়ালের কিংবা কোনো ইঁদুরের। তবে আমি অবশ্য বলবো যে তা একেবারেই অসম্ভব—এমন বিশাল-কোনো জীব কি কোনো খুদে চুহা হ'য়ে উঠতে পারে?'

'*অসম্ভব!*' এবার গ'র্জেই উঠলো খোক্কস। 'বেশ, তাহ'লে নিজের চোখেই দ্যাখ তুই।

আর অমনি সে একটা ছোট্ট ইঁদুরছানায় বদলে গেলো, আর হুড়মুড় ক'রে মেঝের ওপর ছোটাছুটি করতে লাগলো। যেই না বিল্লি উস্তাদ এই চুহার ছানা দেখলে, অমনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সেটা খপ ক'রে খেয়ে ফেললে।

এদিকে তো ততক্ষণে রাজার চোখে প'ড়ে গিয়েছে খোক্কসের ওই চমৎকার কেল্লাটা আর দেখেই তিনি ব'লে উঠেছেন তিনি কেল্লার ভেতরটায় গিয়ে স্বচক্ষে সবকিছু দেখতে চান। বিল্লি উস্তাদ যেই তোল-সেতুটার ওপর ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলে, বাইরে ছুটে বেরিয়ে এসে রাজাকে একটা সেলাম ঠুকে বললে : 'আসুন, আসুন রাজাধিরাজ! মার্কি দ্য কারাবাসের কেল্লা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।'

'আরে, লর্ড মার্কি,' রাজা বললেন, 'এই কেল্লাটাও কি আপনার নাকি? সত্যি, এত বড়ো বাগবাগিচায় আর ওই দালানকোঠায় ভরা কেল্লার চাইতে সুন্দর আর কীই বা হ'তে পারে? বেশ, তাহ'লে ভেতরটাতেও একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক।'

মার্কি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন যাতে রূপসী রাজকন্যা তাঁর হাতটা ধ'রে-ধ'রে গাড়ি থেকে নামতে পারেন, আর তারপর রাজার পেছন-পেছন তাঁরা এসে পৌঁছুলেন মস্ত হলঘরটার সিঁড়ির ধাপের কাছে। হল ঘরটায় ঢুকেই দেখা গেলো তোফা একটা ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে, খোক্কস তার জন্য কয়েক বন্ধুকে খেতে নেমন্তন্ন করেছিলো, তারই জন্যে এই এত সব চর্ব্যচোয্যলেহ্যপেয়র আয়োজন। খোদ রাজামশাই এসে গিয়েছেন শুনে খোক্কসের ইয়ার-দোস্তরা অবিশ্যি বেরুতেই আর সাহস পায়নি।

মার্কি দ্য কারাবাসের এত সব গুণপনা আর জমকালো বাহার দেখে রাজা তো ততক্ষণে মহাখুশি। আর রাজকন্যা? তিনি তো ততক্ষণে মার্কির রূপেগুণে একেবারেই মশগুল। মার্কির এই বিশাল ধনসম্পত্তি দেখে, আর কয়েক গেলাস সরবৎ খেয়ে, রাজা বললেন :

'লর্ড মার্কি, আপনি শুধু মুখ থেকে টুঁ শব্দটি বার করুন, আমি আপনাকে রাজবাড়ির জামাই ক'রে নেবো।'

খুব নিচু হ'য়ে একটা জবরদস্ত কুর্নিশ ক'রে মার্কি রাজার প্রস্তাব-করা সম্মানটা মেনে নিলেন, আর সেদিনই রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'য়ে গেলো। আর বিল্লি উস্তাদ নিজেই তখন থেকে খোদ এক লর্ড বাহাদুর হ'য়ে গেলো আর খোশ মেজাজে নিশ্চিন্ত মনে যত রাজ্যের চুহা শিকার ক'রে বেড়াতে লাগলো।



হুরি-পরি

এক-যে ছিলো বিধবা মহিলা, যার ছিলো দুই মেয়ে। বড়োজন হুবহু মায়ের প্রতিমূর্তি, অবিকল সেইরকম, দেখতেও যেমন মেজাজ-মর্জিতেও তেমন ; দুজনেই ছিলো নাকউঁচু, বদমেজাজি, এমনই মন্দস্বভাব যে কেউই তাদের সঙ্গে ঠিকভাবে মিশতে পারতো না। ছোটো মেয়ে আবার ছিলো ঠিক তার বাপের মতো, স্বভাব ভদ্র, মেজাজ নরম, স্নেহে ভরা, তার ওপর সে ছিলো বোধহয় জগতের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। তো লোকে যেহেতু স্বভাবত তাদেরই ভালোবাসে যারা ঠিক নিজেরই মতো মানুষ, তাই মা তার বড়োমেয়ের প্রায় পুজোই করতো, কিন্তু দু-চক্ষেও ছোটো মেয়েকে দেখতে পারতো না। ছোটো মেয়েকে সে খেতো দিতো সবার শেষে, রসুই ঘরে, আর তাকে দিয়ে প্রায় ক্রীতদাসীর মতো খাটিয়ে নিতো।

অন্য-সব ঘরের কাজের তো কথাই নেই, ছোটো মেয়েকে দিনে দু-বার ক'রে যেতে হ'তো প্রায় দু-মাইল দূরের একটা ঝরনার ধারে, আর বড়ো কলসিতে ক'রে বাড়ির খাবার জল নিয়ে আসতে হ'তো। একদিন সে যখন ঝরনার কাছে গেছে, এক বেচারিমতো গরিব বুড়ি এসে তার কাছে একটু জল খেতে চাইলো।

'জল? এই দিচ্ছি, বুড়িমা,' সুন্দরী মেয়েটি বললে, তারপর কলসিটাকে ভালো ক'রে মেজে ধুয়ে ঝরনার সবচেয়ে টলটলে জল এনে তাকে খেতে দিলে, কলসিটা এমনভাবে ধ'রে রইলো যাতে আঁজলা পেতে

জল খেতে বেচারি বুড়ির কোনো কষ্টই না-হয়।

জল খেয়ে-টেয়ে নিয়ে বুড়ি তাকে বললে, 'তুমি বাছা এত সুন্দর, তায় এমন দয়ার শরীর আর ভদ্র যে তোমাকে আমায় একটা-কিছু উপহার দিতেই হচ্ছে, (আসলে বুড়ি ছিলো এক পরি, এক অসহায় গাঁইয়া বুড়ির বেশ ধ'রে এসে হাজির হয়েছিলো এটাই দেখতে মেয়েটির স্বভাব সত্যি-সত্যি কত ভদ্র আর নরম)।'

'আমি তোমাকে এই উপহার দিচ্ছি,' আর ব'লেই চললো, 'খেয়াল রেখো। তুমি যখনই কোনো কথা বলবে, তোমার মুখ থেকে ঝ'রে পড়বে ফুল আর দামি-দামি রত্নপাথর।'

সদয় মেয়েটি যখন বাড়ি এসে পৌঁছুলো, মা তো তাকে ব'কে-ঝ'কে সারা, এতক্ষণ লাগলো তোর ঝরনা থেকে আসতে, অ্যাঁ?

'মা, তুমি আমায় এবারটির মতো মাফ ক'রে দাও,' মেয়ে বেচারি অনুনয় ক'রে বললে, 'আর-কক্‌খনো এত দেরি হবে না।' আর যেই সে কথা বললে তার মুখ থেকে ঝ'রে পড়লো তিনটি গোলাপ ফুল, তিন-তিনটে মুক্তো, আর মস্ত তিনটে হিরে।

'অ্যাঁ? এ-সব কী দেখছি চোখে,' তাজ্জব হ'য়ে মা চেঁচিয়ে উঠলো। 'আরে! এর মুখ থেকে যে হিরে-জহরৎ মণিমুক্তো ঝ'রে পড়ছে? তো, মেয়ে বল দিকিনি, এমন তাজ্জব কাণ্ড ঘটলো কী ক'রে?'

জীবনে এই প্রথম বার বোধহয় মা তাকে বললো, 'বল দিকিনি তুই মেয়ে'।

বেচারি এবারে খুব সরলভাবে এক-এক ক'রে খুলে বললে ঝরনার ধারে কী হয়েছিলো, যদিও বলবার সময় আরো-একরাশ হিরেজহরৎ তার মুখ থেকে ঝ'রে পড়লো।

'তা-ই বুঝি? সত্যি?' মা বললে। 'তাহ'লে তো এক্ষুনি বড়োকে পাঠাতে হয় ওখানে। এই দ্যাখ, ফ্যানি, তোর বোন যখন কথা বলে তখন তার মুখ থেকে কী বেরিয়ে আসে। তোরও মুখ থেকে হিরে-জহরৎ ঝ'রে পড়ুক, তা কি তুই চাসনে? যদি চাস, তবে তোকে শুধু ওই ঝরনার ধারে যেতে হবে, আর যখন কোনো গরিব বেচারি মেয়ে এসে জল খেতে চাইবে, তখন তাকে গালমন্দ না-ক'রে শুধু একটু জল খেতে দিবি ভদ্রভাবে।'

'হ্যাঁ, কী আব্দার! আমি কিনা ঝরনায় যাবো জল আনতে,' বেশ চ'টে-ম'টেই ব'লে উঠলো বদমেজাজি বড়ো মেয়ে।

'হ্যাঁ, আমি তোকে যেতে বলছি।' তার মা তাকে ধমকেই বললে। 'আর এক্ষুনি—এক্ষুনি যা।'

তো বড়ো মেয়ে তো গেলো, কিন্তু তখনও সে রাগে গজগজ করছে। বাড়ি থেকে সে সবচেয়ে দামি রুপোর কুঁজোটা তুলে নিলে। ঝরনার ধারে গিয়ে পৌঁছেছে কি পৌঁছোয়নি, অমনি সে দেখতে পেলে বনের গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন এক জমকালো ভদ্রমহিলা, কী তাঁর সাজপোশাকের ঘটা, কী তাঁর দেমাকি চাল! এসেই তিনি একটু জল খেতে চাইলেন। ইনি কিন্তু আগেরই সেই পরি, একটু আগেই ছোটো বোনটির কাছে অন্যরকম সাজ ক'রে দেখা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন সেজেছেন ঠিক রানির মতো, যেমন সাজপোশাক তেমনি ঝলমলে চেহারা, এই মেয়ের অভদ্রতা ঠিক কোন সীমায় গিয়ে পৌঁছোয়, সেইটে দেখতেই তাঁর এই বেশভূষার বদল।

'কী? তুমি কি ভেবেছো তোমাকে জল খাওয়াবার জন্যেই আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি,' দেমাকে নাক কুঁচকে বিচ্ছিরি তেরিয়া গলায় বড়ো মেয়ে বললে। 'হ্যাঁ, এই রুপোর কুঁজোটা তো আমি কিনা মহারানির দিলখোশ করবার জন্যেই নিয়ে এসেছি! জল যদি চাও তো, যাও, ঝরনা থেকে আঁজলা ভ'রে

জল নিয়ে খাও।'

'তোমার তো দেখছি ভদ্রতার কোনো বালাইই নেই,' পরি বললে, সে কিন্তু মোটেই মেজাজ খারাপ করেনি। 'ঠিক আছে, তুমি যদি এতই বদস্বভাবি হও, তো তোমাকে আমি একটা উপহার দিচ্ছি : তুমি যখনই কথা বলবে তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে সাপ-ব্যাঙ-কেঁচো-কেন্নো।'

মা তো তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন : 'কী-রে মেয়ে? তারপর?'

'কী-রে মানে কী!' মেয়ের মেজাজ তখনও তিরিক্ষি হ'য়ে আছে। আর অমনি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো দুই জোড়া সাপ, দুই জোড়া কোলা ব্যাঙ।

'হা কপাল!' মা প্রায় আর্তনাদই ক'রে উঠলো। 'এর মানে কী? সব তোর ওই ছোটো বোনটার কুচুটেপনা! দাঁড়া, আমি ওকে এক্ষুনি মজা দেখাচ্ছি!' আর একটা ছড়ি তুলে নিয়ে সে তার ছোটো মেয়ের পেছনে দৌড়ুলো।

বেচারি তো পাঁই-পাঁই ক'রে ছুট লাগালে, শেষে ছুটে গিয়ে ঢুকলো পাশের বনটায়, ঠিক তক্ষুনি রাজপুত্তুর ওখান দিয়ে তাঁর শিকার সেরে ফিরছিলেন। তার ওই ফুটফুটে রূপ দেখে, রাজপুত্তুর জিগেস করলে, ব্যাপার কী। একা-একা ব'সে-ব'সে এই বনে সে কাঁদছে কেন অমন?

'হায়, হুজুর, কী-যে বলি! আমার মা আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

রাজপুত্তুর যেই দেখলে পাঁচ-ছটা মুক্তো আর পাঁচ-ছটা হিরে তার মুখ থেকে ঝ'রে পড়লো, অমনি জিগেস করলে, হঠাৎ এই ঝামেলার কারণটা কী? তখন মেয়েটি তার সারা কাহনটাই রাজপুত্তুরকে শুনিয়ে দিলে। রাজপুত্তুর তক্ষুনি তার প্রেমে প'ড়ে গেলো, আর ভেবে দেখলো হুরি-পরিদের দেয়া অমন উপহার হাজারো যৌতুকের চেয়েও বেশি দামি, অমনি তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো রাজপুরীতে, আর তাকে বিয়ে ক'রে বসলো।

আর বড়ো বোন? তার কী হ'লো? সে সবকিছু বেগড়বাই ক'রে নিজেকে এতটাই অলপ্যেয়ে ক'রে তুলেছিলো যে তার মা-ই শেষটায় তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। আর এই দুর্ভাগা মেয়ে কত ঘুরলো কত ফিরলো, কিন্তু এমন-কাউকে পেলো না যে তাকে একটু ভালোবাসবে কিংবা বিয়ে করবে। শেষটায় সে চ'লে গেলো বনের একেবারে মাঝখানে, আর সেখানেই একদিন দুম ক'রে ম'রে গেলো।



অঙ্গারিনা

এক ছিলেন বনেদি ভদ্রলোক, তিনি দ্বিতীয় বিয়েটা করেছিলেন জগতের সবচেয়ে দেমাকি আর বদমেজাজি মহিলাকে। ওই মহিলার ছিলো দুই মেয়ে, দুটিই মায়ের মতো, সবকিছুতেই তারা মায়ের মতো ভাবভঙ্গি আর কাজকারবার ক'রে চলতো। আর ভদ্রলোকের আগেই হয়েছিলো এক মেয়ে, সে ছিলো মাধুরীরই প্রতিমা ; সে তার স্বভাবের ওই মাধুর্য পেয়েছিলো তার মায়ের কাছ থেকে, তার মা ছিলেন জগতের সবচেয়ে দরাজদিল, সহৃদয়া।

বিয়ের অনুষ্ঠান চুকে যেতেই সৎমাটি তাঁর বিচ্ছিরি স্বভাবের পরিচয়টা দিয়ে ফেললেন। ওই তরুণীর কোনো সদ্‌গুণই তাঁর সহ্য হচ্ছিলো না, কারণ তাতে তাঁর নিজের মেয়ে দুটিকে আরো-আরো অপছন্দ হ'য়ে যায়। তিনি মেয়েটিকে ঘর-গেরস্থালির সবচেয়ে বিচ্ছিরি আর কঠিন কাজগুলো সারতে দিলেন। সে-ই বাসনকোসন ধোয়, সিঁড়ির ধাপগুলো সাফ করে, সৎমার ঘর ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে-পুঁছে দেয়, আর ওই দুই মিসিবাবারও। সে শোয় বাড়ির সবচেয়ে উঁচুতে, একটা চিলেকোঠায়, জাজিমটা কেমন তোবড়ানো, জায়গায়-জায়গায় শক্ত ; ওদিকে তার দুই সৎ বোন শোয় প্যানেল দেয়া দুই ঘরে, যেখানে আছে সবচেয়ে আধুনিক নরম জাজিমের বিছানা আর বড়ো-বড়ো আয়না, যাতে পায়ের পাতা থেকে মাথা অব্দি নিজেদের

তাকিয়ে-তাকিয়ে অবলোকন করতে পারে। বেচারি মেয়েটি সবকিছুই হাসিমুখে স'য়ে যায়, বাবার কাছে কোনো নালিশ জানাতেও তার সাহস হয় না। তিনি তো উলটে তাকেই ধমক লাগাবেন, কারণ তিনি যে ওই মহিলাটির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলায় ওঠবোস করেন।

সারাদিনের কাজটাজ সাঙ্গ হ'লে মেয়েটি চ'লে যেতো চিমনির কোণটায়, পোড়া কাঠকয়লা অঙ্গারের মাঝখানে ব'সে থাকতো, সেইজন্যে বাড়ির সবাই তাকে জানতো পোড়া কয়লা ব'লে। তার যে ছোটো সৎবোন, সে তার দিদির মতো অত বিচ্ছিরি স্বভাবের নয়, সে তাকে ডাকতো অঙ্গারিনা ব'লে। অঙ্গারিনা, কিন্তু, তার ছেঁড়াখোঁড়া জামা আর ঘাঘরা সত্ত্বেও, তার বোনেদের চেয়ে পঞ্চাশগুণ বেশি সুন্দরী ছিলো, যতই তারা সাজগোজ প্রসাধন করুক না কেন।

একদিন রাজার ছেলে এক বল নাচের আসর বসালে, তাতে সব অভিজাত বনেদি বাড়ির লোকজনকেই নেমন্তন্ন জানানো হয়েছিলো। আমাদের ওই দুই সাজিয়ে-গুজিয়ে বোনও নেমন্তন্ন পেয়েছিলো, কারণ এই তল্লাটে এর মধ্যেই তারা বেশ নাম ক'রে নিয়েছে। তো গেলো তারা বল নাচের আসরে, আহ্লাদে ডগমগ, কাপড়জামা খুব ক'রে বেছে-টেছে সাজগোজ করলে, প্রসাধন সারলে, চুল বাঁধলে—যাতে তাদের আরো ভালো মানায়। অঙ্গারিনার জন্যে তো কাজ ঢের বেড়ে গেলো, কারণ তাকেই ইস্তিরি করতে হ'লো তাদের জামাকাপড়, অন্তর্বাস, জামার হাতায় রঙিন সুতো দিয়ে নকশা ক'রে দিতে হ'লো। ওই দুই বোনের মুখে শুধু একটাই কথা কী-কী তারা পরবে।

'আমি,' বড়ো বোন বললে, 'পরবো আমার লাল মখমলের জামাটা যার গলার কাছটায় বিলিতি লেস-এর ঝালর লাগানো।'

'আমি,' ছোটোজন বললে, 'পরবো আমার শাদাসিধে ঘাঘরাটাই, কিন্তু ওপরে পরবো সোনার জরির কাজ-করা জামা আর হিরের বোতাম—সে তো আর চট ক'রে সব জায়গায় দেখা যায় না।'

নামজাদা এক কেশশিল্পীকে তলব করা হ'লো, ডবোল বিনুনি বেঁধে দেবার জন্যে, আর চুল বাঁধার জন্যে আনানো হ'লো মানানসই রেশমি ফিতে। অঙ্গারিনাকে তারা ডেকে পাঠালে, বেশভূষা দেখে সে তার মত দেবে—কারণ তার রুচি ছিলো চমৎকার। সে বাহার বাড়াবার জন্যে কতগুলো পরামর্শ দিলে, এমনকী বললে বিনুনি নয়, তাদের সে চুড়ো খোঁপা বেঁধে দিলে নিজেই; তারা খুশি হ'য়ে তার পরামর্শ মেনে নিলে।

সে যখন তাদের খোঁপা বেঁধে রঙিন ঝালর পরিয়ে দিচ্ছে, তারা তাকে জিগেস করলে :

'আচ্ছা, অঙ্গারিনা, ওই বল নাচের আসরে তুমি কেমন সেজে যাবে বলো তো?'

'আরে বাব্বা! তোমরা দেখছি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছো। আমার কি ও-সব জায়গায় যাওয়া মানায়?'

'সে তো তুমি ঠিকই বলেছো। গেলে, সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো মশকরা। লোকে তো হেসেই উঠবে—যদি নাচের আসরে তারা অঙ্গার-মাখা কাউকে দেখতে পায়।'

অন্য যে-কেউ হ'লে তাদের কবরী বেঁধে দিতো শুধু ফিতের কতগুলো ফাঁস বেঁধেই, কিন্তু অঙ্গারিনার স্বভাবটা তো মধুর, সে তাদের চুড়ো খোঁপা বেঁধে দিলে নিখুঁতভাবে। পাকা-এক কেশশিল্পীর মতোই। দু-দিন ধ'রে তারা উত্তেজনায় এমনই মশগুল হ'য়ে ছিলো প্রায় কিছুই খেয়ে উঠতে পারেনি। তাদের আঁটো অন্তর্বাসকে আরো আঁটশাঁট করতে গিয়ে—যাতে তাদের কটিদেশ খুব ছিপছিপে দেখায়—তারা প্রায় এক ডজন লেসই ছিঁড়ে ফেললো, আয়নার কাছ থেকে কখনোই আর নড়লে না।

অবশেষে এলো সেই উৎসবের দিন। তারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলো; যতক্ষণ-না তারা চোখের

আড়ালে চ'লে গেলো, অঙ্গারিনা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাদের যাওয়া দেখলে। যখন আর তাদের চোখে পড়ে না, সে হাপ্‌শ নয়নে কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। তার ধর্মমা তাকে অমনভাবে চোখের জল ফেলতে দেখে জিগেস করলেন ব্যাপার কী।

'যদি শুধু আমি...যদি শুধু আমি...' সে এতই কাঁদছিলো যে কথাটাও শেষ করতে পারছিলো না।

তার ধর্মমা তো একজন পরি, সব জানেন। বললেন, 'কী? যদি শুধু তুমি ওই বলনাচের আসরে যেতে পারতে, তা-ই না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা-ই,' মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে অঙ্গারিনা।

'বেশ,' বললেন তার পরি-মা, 'লক্ষ্মী মেয়েটি হ'য়ে থাকো এখন। আমি সময়মতোই তোমাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে হাজির ক'রে দেবো।'

পরি-মা তাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। 'যাও, গিয়ে বাগান থেকে আমাকে একটা কুমড়ো এনে দাও।'

অঙ্গারিনা প্রায় ছুটেই চ'লে গেলো বাগানে, সবচেয়ে ভালো যে-কুমড়োটা ছিলো সেটাকে গাছ থেকে কেটে নিয়ে এলো তার পরি-মার কাছে, কিন্তু এটা তার মাথায় ঢুকছিলো না ওই কুমড়োটা তাকে কী ক'রে ওই নাচের জলশায় নিয়ে যাবে। তাঁর পরি-মা শুধু তার খোলটা রেখে ভেতরটা চেঁছে বার ক'রে দিলেন, তারপর সেটাকে ছুঁলেন তাঁর কুহককাঠি দিয়ে, আর অমনি কী অবাক কাণ্ড! সেটা কিনা একটা জমকালো সোনার কাজ-করা কোচবাক্স হ'য়ে গেলো।

তারপর অঙ্গারিনা গেলো তার ইঁদুর-ধরা ফাঁদ দেখতে, দেখতে পেলে জালের মধ্যে ছ-টা ইঁদুর, সব্বাই জ্যান্ত। পরি মা বললেন ওই ইঁদুর-ধরা ফাঁদের দরজাটা আলতো ক'রে একটু খুলে ধরতে, আর যেই একেকটা ক'রে ইঁদুর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এলো তিনি তার কুহককাঠি দিয়ে তাদের ছুঁয়ে দিলেন, আর ওই পরশ কাঠির ছোঁয়ায় তারা সবাই দুর্দান্ত ছ-টা ঘোড়া হ'য়ে গেলো, প্রত্যেকেরই গায়ে ইঁদুর-রঙা ধূসর ছোপ।

যখন পরি-মা ভাবছেন তিনি কী ক'রে একজন কোচোয়ান বানাবেন, অঙ্গারিনা তাঁকে বললে :

'যাই, গিয়ে দেখে আসি ধেড়ে-ইঁদুর ধরা ফাঁদটায় কোনো ধেড়ে-ইঁদুর ধরা পড়েছে কি না—তারপর তাকেই না-হয় কোচোয়ান বানিয়ে দেয়া যাবে।'

'ঠিক ভেবেছো,' পরি-মা বললেন, 'যাও, ছুটে গিয়ে দেখে এসো।'

অঙ্গারিনা তার ধেঁড়ে-ইঁদুর ধরা ফাঁদটা নিয়ে এলো, তাতে তিনটে ইয়া-ধাড়ি-ধাড়ি ইঁদুর। পরি-মা তাদের মধ্য থেকে একটাকে বেছে নিলেন তার জমকালো গোঁফ জোড়ার জন্যে, আর তাকে পরশকাঠি দিয়ে ছুঁতে-না-ছুঁতেই সে হ'য়ে গেলো মোটাশোটা এক কোচোয়ান, তল্লাটে তার গোঁফ জোড়াই সবচেয়ে জমকালো।

তারপর তিনি বললেন : 'যাও তো, বাগানে গিয়ে দেখতে পাবে জলের ঝাঁঝরিটার পেছনে ছটা গিরগিটি আছে। ছ-টাকেই আমার কাছে নিয়ে এসো।'

অঙ্গারিনা তাদের নিয়ে আসা মাত্র, তার পরি-মা তাদের ছ-ছজন চাপরাশিতে বদলে দিলেন, তারা তাদের ডোরাকাটা উর্দি গায়ে কোচবাক্সের পেছনে গিয়ে জায়গা নিলে, এমনি ওস্তাদ ভঙ্গিতে যেন সারা জীবন ধ'রে তারা শুধু তা-ই ক'রে আসছে।

তারপর পরি-মা অঙ্গারিনাকে বললেন :

'বেশ। নাচের জলশায় যাবার আয়োজন তো হ'য়ে গেলো। কী, তোমার খুশি লাগছে না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি কি আমার এই বিচ্ছিরি ছেঁড়া কানিগুলো প'রে ওখানে যাবো?

তার পরি-মা কুহককাঠি দিয়ে শুধু তাকে ছুঁয়ে দিলেন, অমনি তার গায়ের পোশাক মুহূর্তে বদলে গেলো সোনারুপোর জরির কাজ-করা জামায়, দামি-দামি পাথরগুলো জামার গা থেকে ঝিলকোচ্ছে। তারপর তিনি তাকে দিলেন একজোড়া নাচের জুতো, কাচে তৈরি, কী চমৎকারভাবেই যে বানানো!

তো, এইভাবে, সেজেগুজে, অঙ্গারিনা গিয়ে বসলো কোচবাক্সে ; কিন্তু তার পরি-মা তাকে পই-পই ক'রে ব'লে দিলেন রাত বারোটার পর সে এক লহমাও যেন ওখানে না-থাকে, যদি থাকে তবে পর মুহূর্তেই ওই নাচের আসরেই তার কোচবাক্স বদলে যাবে কুমড়োর খোলে, ঘোড়াগুলো সব হ'য়ে যাবে ইঁদুর, তার চাপরাশিরা হ'য়ে যাবে গিরগিটি, আর তার ওই জমকালো বেশভূষা আবার হ'য়ে যাবে বিচ্ছিরি ছেঁড়া কানি।

অঙ্গারিনা তার পরি-মাকে কথা দিলে সে মাঝরাতের আগেই নাচের জলশা ছেড়ে চ'লে আসবে, আর টগবগ-টগবগ ক'রে ছুটলো ঘোড়াগুলো, সে রওনা হ'য়ে পড়লো আহ্লাদে আটখানা।

যখন রাজার ছেলেকে গিয়ে জানানো হ'লো কোথাকার কোন রাজকুমারী এসে হাজির হয়েছেন—কেউ জানে না কোথাকার রাজকন্যা তিনি—রাজকুমার ছুটে চ'লে এলো তাকে অভ্যর্থনা করতে। সে-ই হাত ধ'রে তাকে কোচবাক্স থেকে নামালে, তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো হল ঘরে যেখানে তার অন্য অতিথিরা আছে। হঠাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে এলো হল ঘরে ; নাচ থেমে গেলো, বেহালার ছড়ি আর কেউ টানছে না, সব্বাই অভিভূত হ'য়ে শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে ওই অজানা অচেনা রাজকন্যাকে, তার মোহিনী রূপে সবাই মুগ্ধ, সম্মোহিত। শুধু নিচু গলার ফিশফিশ কথা শোনা গেলো : 'আহ্, কী সুন্দর যে দেখতে!' খোদ রাজামশাই, তিনি তো বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন, অঙ্গারিনার ওপর থেকে চোখই সরাতে পারছেন না, ফিশফিশ ক'রে রানিকে শুধু বললেন এমন পরমা রূপসী ডানাকাটা পরিকে তিনি যে কতদিন বাদে আবার চোখে দেখলেন। মহিলারা সবাই তার সাজগোজ দেখতেই ব্যস্ত, কেমন তার কবরীর বাহার যাতে পরদিন সকালেই নিজেদের জন্যে ও-রকম জিনিশ আনিয়ে নিতে পারে, অবশ্য যদি এমন চমৎকার কাপড় কোথাও পাওয়া যায় আর খুব-ওস্তাদ কোনো খলিফা মেলে।

রাজকুমার তাকে ধ'রে এনে বসালে প্রধান আসনটায়, পরে তাকে হাত ধ'রে নিয়ে গেলো বল নাচতে। অঙ্গারিনা এমনি লীলায়িত ভঙ্গিতে নাচলে যে সে সকলেরই কাছ থেকে আরো তারিফ কুড়োলে, পরে দারুণ এক নৈশভোজের মুখরোচক সব খাবার এলো, কিন্তু রাজকুমার কিছু খাবে কী—সে শুধু হাঁ ক'রে অঙ্গারিনাকেই দেখছে। অঙ্গারিনা গিয়ে বসলো তার বোনদের পাশে, আর তাদের সঙ্গে খুবই সৌজন্য দেখিয়ে খাতির করলে। রাজকুমার তাকে যে নারঙ্গ আর লেবুগুলো দিয়েছে সে-সব সে তাদেরও ভাগ ক'রে দিলে। তারা তো ভারি অবাক : তারা তো আর তাকে চিনতেই পারেনি।

যখন তারা গল্প করছে, তখন অঙ্গারিনা হঠাৎ ঘণ্টা শুনে তাকিয়ে দেখলে, বারোটা বাজতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। সে মাথা নুঁইয়ে সবাইকে কুর্নিশ ক'রে যত তাড়াতাড়ি পারে আসর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

বাড়িতে পৌঁছেই সে সটান চ'লে গেলো তার পরি-মার কাছে, তাঁকে কী ব'লে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে তার কোনো কথাই সে খুঁজে পাচ্ছিলো না, বললে যে কালকে রাতেও সে আবার ওই নাচের জলশায় যেতে চায়, কারণ রাজকুমার তাকে বেশ অনুনয় ক'রেই বলেছে আবার নাচে আসতে। যা-যা ঘটেছে, সব যখন সে তার পরি-মাকে বিশদ ক'রে সবিস্তারে বলছে তখন তার দুই বোন ফিরে এসে দরজায়

ঘা দিলে—অঙ্গারিনা দরজা খুলতে চ'লে গেলো।

'ঈশ, কত রাত ক'রে ফেলেছো তোমরা।' চোখ রগড়াতে-রগড়াতে, হাই তুলে গা-হাত-পা ছড়িয়ে সে এমনভাবে কথাগুলো বললে যে সে যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে (যদিও যখন শেষ তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তার চোখে ঘুমের কোনো লেশই ছিলো না)।

'তুই যদি ওই নাচের জলশায় যেতিস,' বোনেদের একজন বললে, 'তাহ'লে তোর আর হাই উঠতো না। এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা এসেছিলো সেখানে—সত্যিকার মনোহারিণী রূপসী। আমাদের সঙ্গে কত আলাপ-টালাপ করলো সে। আমাদের নারঙ্গ আর লেবুও দিলো।'

অঙ্গারিনা যদি পারতো তো নিজেকেই বুঝি জড়িয়ে ধরতো আহ্লাদে। সে তাদের রাজকন্যার নাম জিগেস করলে, কিন্তু তারা বললে, ওখানকার কেউই নাকি তাকে চেনে না—আর খোদ রাজকুমারও তাইতে একটু বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলো—সে যে কে, সে-কথাটা যে তাকে ব'লে দিতে পারতো, রাজকুমার হয়তো তাকে যা-খুশি-তা-ই বখশিশ দিয়ে দিতে পারতো। অঙ্গারিনা মৃদু হেসে তাদের বললে :

'সে বুঝি খুবই সুন্দরী ছিলো? সত্যি, তোদের কী ফাটা কপাল। তোরা তাকে চর্মচক্ষে দেখে এসেছিস! আমি কি একবার ওই রাজকন্যাকে নিজের চোখে দেখতে পারি না? দোহাই, জাভোৎ দিদি, আমাকে তোমার ওই জাফরানি রঙের পোশাকটা ধার দেবে—ওই যেটা প'রে তুমি বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াও!'

'অ্যাঁ!' জাভোৎ দিদি তাকে বললে : 'কী একখানা আব্দার! কোনো কয়লামাখা অঙ্গারিনাকে কিনা নিজের অমন একটা পোশাক ধার দিতে হবে! তাহ'লে আমাকে তো কোনো খেপি মেয়ে হ'য়ে উঠতে হয়!'

অঙ্গারিনা আশাই করেছিলো তার আরজিটা নামঞ্জুর হবে। ফলে নারাজ কথা শুনে সে খুব খুশিই হ'লো, কারণ তার বোন যদি তাকে ওই ফ্রক ধার দিতো তো সে তো বেজায় মুশকিলে প'ড়ে যেতো।

পরদিন দুই বোন আগেই চ'লে গেলো নাচের জলশায়, অঙ্গারিনাও গেলো পরে, আর আগের দিনের চাইতেও আরো চমৎকার সাজগোজ ক'রে। রাজকুমার তো তার সঙ্গে লেপটেই থাকে, কিছুতেই তাকে কাছ ছাড়া করতে চায় না, আর সারা সন্ধ্যাটা তার কানে-কানে শুধু ভালোবাসারই কথা শোনালে। তরুণী তো খুশিতে এতই ডগমগ হ'য়ে উঠেছিলো যে পরি-মার হুঁশিয়ারিটা তার আর মনেই থাকেনি। সে আচমকা শুনতে পেলে দেয়াল-ঘড়ি থেকে ঢং ক'রে রাত বারোটার প্রথম ঘণ্টাটা পড়ছে, অথচ এতক্ষণ সে ভাবছিলো সবে বুঝি রাত এগারোটা বেজেছে। ঢং শুনেই সে ছুটে বেরুলো, চিতল হরিণীর মতো বেগে। রাজকুমারও তার পিছু নিলে, কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল ধরতে পারলে না। তাড়াহুড়োয় অঙ্গারিনার কাচে তৈরি নাচের জুতোর একপাটি পা থেকে খ'সে পড়েছিলো, রাজকুমার খুব যত্ন ক'রে সেটা তার হাতে ক'রে উঠিয়ে নিলে।

অঙ্গারিনা বাড়ি পৌঁছুলো রুদ্ধশ্বাসে, কোনো কোচবাক্স নেই, কোনো চাপরাশি নেই, পরনে তার ওই চিরকেলে বিচ্ছিরি ছেঁড়া কানি। তার এত-সব দামি-দামি বেশভূষার কিছুই আর নেই, শুধু তার ওই নাচের জুতো জোড়ার একপাটি ছাড়া—যার আরেক পাটি সে খুইয়ে এসেছে। রাজবাড়ির দেউড়ির পাহারোলাদের জিগেস করা হ'লো তারা কোনো রাজকন্যাকে এই ফটক দিয়ে যেতে দেখেছে কিনা। তারা বললে খুব ছেঁড়া জামাকাপড়পরা এক ভিখারিনিকে ছাড়া—বোধহয় চাষীর মেয়ে হবে—তারা আর-কাউকেই এই ফটক দিয়ে যেতে দ্যাখেনি।

দুই বোন যখন নাচের জলশা থেকে ফিরে এলো, অঙ্গারিনা জিগেস করলে আজকেও তারা আবার খুব আমোদ-আহ্লাদ করেছে কি না, আর ওই রূপসী রাজকন্যা কি আজকেও আবার এসেছিলো। তারা বললে তারা তো জমিয়েই ফুর্তি করেছে, তবে রাজকন্যা ছুটে পালিয়ে গেছে, রাত বারোটার প্রথম ঘণ্টা

পড়বামাত্র, এত হুড়মুড় ক'রে পালিয়েছে যে তাড়াহুড়োয় তার নাচের জুতোর এক পাটি ওখানে পা থেকে খ'সে প'ড়ে যায়—ছোট্ট এক কাচে তৈরি চমৎকার নাচের জুতো। রাজকুমার নিজে সেটা তুলে নেয়, নাচের আসরে বাকি সময়টা সে শুধু হা-পিত্যেশ ক'রে সেটার দিকেই তাকিয়ে থেকেছে। সন্দেহ নেই, ওই জুতোটা যার, সেই সুন্দরীর প্রেমে এখন সে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তারা ঠিকই বলেছিলো। কারণ, দিন কয়েক বাদেই রাজার ছেলে শিঙা-নাকাড়া বাজিয়ে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সারা নগরে ঘোষণা করলে যে যার পায়ে ওই কাচে তৈরি জুতো ঠিক-ঠিক মাপ মতো লেগে যাবে, সে সেই মেয়েকেই বিয়ে করবে। তারপর তারা নানা রাজ্যের রাজকন্যাদের পায়ে সেটা পরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে—পায়ে ঠিকমতো লাগে কিনা, তারপর সব ডাচেসদেরও পায়ে পরাবার চেষ্টা করা হ'লো, তারপর রাজসভার অন্য মহিলাদের পায়ে, কিন্তু কারুই পায়ে লাগলো না ওই জুতো, কারু পায়ের মাপেই এটা তৈরি নয়। তারপর ওই দুই বোনের কাছেও সেটা নিয়ে আসা হ'লো, তারা জোরজারি ক'রে কোনো মতে ওই জুতোয় পা গলাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তবু সেই জুতো পরতেই পারলে না। অঙ্গারিনা সব তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলো, সে তো নিজের ওই জুতোটা দেখেই তক্ষুনি চিনতে পেরেছে, সে খিলখিল ক'রে হেসে ব'লে উঠলো :

'একবার আমিও চেষ্টা ক'রে দেখি আমার পায়ে জুতোটা ঠিক লাগে কি না!'

তার বোনেরা তো হেসেই কুটিপটি, তারা তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক'রে কত কথাই যে বললে, কিন্তু যে-ভদ্রলোক রাজবাড়ি থেকে জুতোটা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি খুব নজর দিয়ে অঙ্গারিনাকে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন, দেখলেন যে মেয়েটি অতীব সুন্দরী, আর তার ওই অনুরোধটাও খুব যুক্তিযুক্ত, তাঁকে তো দায়িত্বই দেয়া হয়েছে সব মেয়েরই পায়ে ওটা পরিয়ে দেখবার জন্যে। তিনি অঙ্গারিনাকে তাঁর সামনে এসে বসতে বললেন, আর তার পায়ের কাছে জুতোর পাটি নিয়ে দেখলেন সেটা চমৎকার তার পায়ে মানিয়ে গেছে, কোনো জোরজবরদস্তি না-ক'রেই, যেমন ক'রে কারু হাত কোনো দস্তানায় ঠিক মাপমতো লেগে যায়।

চমকে যাওয়ারই পালা এলো দুই বোনের, বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। কিন্তু চমকের আরো বাকি ছিলো, যখন অঙ্গারিনা তার জামার পকেট থেকে বার ক'রে আনলে সেই জুতোরই অন্য পাটিটা। আর সেটায় তার অন্য পাটা গলিয়ে দিলে। আর সেখানেই তখন পরি-মায়ের আগমন। তাঁর কুহককাঠি দিয়ে অঙ্গারিনার জামাকাপড় ছুঁয়ে দিতেই তার বেশভূষা হ'য়ে উঠলো চমকপ্রদ, অন্য দু-দিনের চেয়েও ঢের, ঢের-বেশি, জমকালো।

আর তখনই দুই বোন তাকে চিনে নিলে, ওই মনোহারিণী ডানাকাটা পরিকে—ওই রাজকন্যাকে—তার সঙ্গে তাদের আলাপ হয়েছে নাচেরই জলশায়। অমনি তারা দুম ক'রে তার পায়ে প'ড়ে গিয়ে কাকুতিমিনতি ক'রে ক্ষমা চাইতে শুরু ক'রে দিলে—অ্যাদ্দিন তারা তার সঙ্গে যত অসদ্ব্যবহার করেছে তার জন্যে বারে-বারে ক্ষমা চাইলে তাব্য। অঙ্গারিনা নিজের হাতে দুই বোনকে মেঝে থেকে তুলে ওঠালে, তারপর দুজনকেই চুমু খেলে আদর ক'রে, বললে যে তাদের সে অন্তর থেকেই মাফ ক'রে দিয়েছে, এখন থেকে তারা যেন সবসময় তাকে ভালোবাসে। ওই জমকালো বেশভূষায় সাজা অঙ্গারিনাকে তারপর নিয়ে যাওয়া হ'লো তরুণ রাজকুমারের কাছে। তার তো অঙ্গারিনাকে দেখেই মনে হ'লো একে যেন আগের চাইতেও আরো অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে। আর কয়েকদিন বাদেই সে তাকে বিয়ে করলে। অঙ্গারিনা, সে যেমন রূপসী তেমনি আবার দয়ামায়ায়ও ভরা—সে তার দুই বোনকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলো থাকতে, আর তার বিয়ের দিনেই দুই বোনেরই বিয়ে দিয়ে দিলে রাজসভার দুই মস্ত অভিজাত যুবকদের সঙ্গে।



রিকি-র ঠিকই লম্বা টিকি

এক-যে ছিলেন রানি, তিনি এমন-এক ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন যে সে এতই কিম্ভূতকিমাকার আর বিকলাঙ্গ ছিলো যে অনেক দিন ধ'রেই লোকে সে আদৌ মানুষ কি না, সে-নিয়েই খটকায় প'ড়ে গিয়েছিলো। তার জন্মের সময় এক পরি হাজির ছিলো, সে কিন্তু ব'লে দিলে যে সে তার চটজলদি দুর্দান্ত বুদ্ধির জন্যেই সকলের প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠবে, ভালোবাসার মানুষ হ'য়ে উঠবে। সে আরো বললে, যে-শক্তি সে তার ভেতর সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছে যে তাতে এই ছেলে নিজের যত বুদ্ধি আছে সব সে সবচেয়ে-বেশি যাকে ভালোবাসে তার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

রানি বেচারিকে এ-সব কথা খানিকটা সান্ত্বনা দিলে বটে : অমন-এক কদাকার ছেলে পৃথিবীতে আমদানি ক'রে তাঁর মন ভারি মুষড়ে পড়েছিলো। সত্যি-যে, এই বাচ্চা কথা বলতে শেখবামাত্র কত-যে সুন্দর-সুন্দর কথা গুছিয়ে বলেছিলো, আর তার চলন-বলন সবকিছুর মধ্যেই এমন-এক মনোহর ভঙ্গিমা ছিলো যে সব্বাই একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। আমি তো বলতেই ভুলে গিয়েছি যে এই ছেলে জ'ন্মেই ছিলো মাথায় এক টিকি নিয়ে, চুলের একটু গুছি, আর সেই জন্যেই সব্বাই তাকে ডাকতো *রিকি, ঠিকই লম্বা টিকি* ব'লে। রিকি ছিলো তার বাড়ির নাম।

সাত-আট বছর বাদে, পাশের এক রাজ্যের রানি জন্ম দিলেন যমজ দুই বোনের। তাদের মধ্যে প্রথম যে ধরাতলে এলো সে ছিলো ফুটফুটে একটা দিনের মতোই সুন্দর। রানি খুশিতে এমনি ডগমগ হ'য়ে উঠলেন যে আশপাশে যারা ছিলো তারা ভাবলে এত আহ্লাদে রানির কোনো ক্ষতি না হ'য়ে যায়। রিকির জন্মের সময় যে-পরি হাজির ছিলো, সে ছিলো সেখানেও, আর রানির এই আদিখ্যেতা ঠাণ্ডা করার জন্যেই সে বললে যে রাজকন্যার বুদ্ধিশুদ্ধি ব'লে কিছুই থাকবে না, যত রূপসী হবে তার সঙ্গে তাল রেখে ততটাই হাবাগোবা হবে।

এক্কেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন রানি তখন, তবে কয়েক মুহূর্ত বাদে তাঁর মনখারাপ আরো অনেক বেড়ে গেলো, কারণ যখন যমজদের মধ্যে দ্বিতীয়জন জন্মালো, সে হ'লো একেবারেই বদখত দেখতে।

'অত মনখারাপ করবেন না, রানিসাহেবা,' পরি বললে। 'আপনার এই মেয়ের অন্য অনেক গুণ থাকবে, তাতে রূপের এই ছিরি ডবোল পুষিয়ে যাবে। সে এতই বুদ্ধিমতী হবে যে লোকের খেয়ালই হবে না সে দেখতে এত খারাপ—রূপের কোনো র-ও তার নেই!'

'সর্বান্তঃকরণে আমি সেটাই আশা করি,' রানিসাহেবা বললেন। 'কিন্তু বড়োটার মগজের ঘিলুতে অন্তত একটুখানিও বুদ্ধি কি ঢুকিয়ে দেয়া যায় না—ও দেখতে এত সুন্দর!'

'বুদ্ধির ব্যাপারে আমি ওর কোনো উপকারই করতে পারবো না, রানিসাহেবা,' পরি বললে, 'তবে তার রূপের ব্যাপারে আপনি যা চাইবেন সব ক'রে দিতে পারি। তো আপনার যাতে মোটেই মনখারাপ না-হয় সেইজন্যে আমি ওর মধ্যে একটা বিশেষগুণ ঢুকিয়ে দিতে পারি : যাকে ওর সবচেয়ে ভালো লাগবে তাকেই সে রূপে ভরিয়ে দিতে পারবে।'

দুই বোন যতই বড়ো হ'তে লাগলো, তাদের যার-যার গুণও তাদের সঙ্গে-সঙ্গেই বেড়ে চললো। সারা দেশ বড়োজনের রূপে আর ছোটোজনের বুদ্ধিতে মোহিত হ'য়ে সারাক্ষণ তারিফ করতে থাকে। এটা অবিশ্যি সত্যি-যে বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বাজে-বাজে বৈশিষ্ট্যগুলোও বেড়ে চললো। ছোটোজনকে মনে হ'লো দিন-দিনই যেন দেখতে আরো বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছে, আর বড়োজন নির্বোধ থেকে নির্বুদ্ধিতর। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে হয় সে কোনো কথাই কয় না, আর নয়তো হাবাগোবা উত্তর দেয়। তাছাড়া কাজেকর্মেও সে এত অপটু যে ম্যান্টলপিসের ওপর মাত্র চারটে ফুলদানিও সাজিয়ে রাখতে পারে না—অন্তত একটা তো ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবেই ; কিংবা এক গেলাস জল খেতে গেলে আদ্ধেকটাই জামাকাপড়ে প'রে গিয়ে তাকে ভিজিয়ে দেবে।

কোনো তরুণীর কাছে রূপ কিন্তু মস্ত এক সম্পদ; যেখানেই তারা যাক না কেন, ছোটোর জন্যে চাহিদাই বড়োজনের চাইতে ঢের-ঢের বেশি হ'য়ে যায়। গোড়ায়-গোড়ায় লোকে সুন্দরীর পাশেই ভিড় জমিয়ে থাকতো, তাকে দেখবামাত্রই বাহবা দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শিগগিরই গিয়ে তারা ভিড় জমালে বুদ্ধিমতীর পাশে, সে যে কত মজার-মজার কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারে, শুধু সে-সবই স্বকর্ণে শুনবে বলে। পনেরো মিনিট কাটতে-না-কাটতেই তারা গিয়ে ভিড় জমায় ছোটোজনকে ঘিরে, বড়োর কাছে আর কেউই থাকে না।

একেবারে হাবাগোবা হ'লে কী হয়, বড়ো কিন্তু সবকিছুই খেয়াল ক'রে দ্যাখে, আর সে স্বেচ্ছায় তার আদ্ধেক সৌন্দর্যও বিলিয়ে দিতো যদি তার বদলে ছোটোবোনের বুদ্ধির একটুখানিও পেতো। রানিসাহেবা, তাঁর তো জ্ঞানগম্যি অনেক, কিন্তু তবু মাঝে-মাঝে তিনি তাকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে ধমক না-দিয়ে পারেন না, আর তাতে বেচারি রাজকন্যার দুঃখ আর হতাশা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

একদিন, সে যখন একা-একাই গেছে এক বনে, সেখানে একা-একাই মন খুলে কান্না জুড়ে দেবে ব'লে, সে দেখতে পেলে তার দিকে কদাকার এক বামন এগিয়ে আসছে। দেখতে অমন কিম্ভূতকিমাকার হ'লে কী হয়, পরনে কিন্তু জমকালো দামি পোশাক। এ হ'লো রিকি, ঠিকই, যার কিনা লম্বা টিকি। সে তার একটা ছবি দেখেই একেবারে প্রেমে প'ড়ে গিয়েছে, সুন্দরী রাজকন্যার ছবি সবখানেই বিলোনো হয়েছিলো ; আর সেই ছবি দেখে সে তার বাবার রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, যদি তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়, যদি তার সঙ্গে একটা-দুটো কথা বলা যায়।

তাকে ওখানে অমনভাবে একলা দেখতে পেয়ে দারুণ খুশি হ'য়ে সে সসম্ভ্রমে, খুব শিষ্টাচার সম্মত-ভাবেই, তার কাছে এগিয়ে এলো। তাকে তার রূপের জন্যে তারিফ ক'রে, সে তাকে এত মনমরা দেখতে পেয়ে, জিগেস করলে :

'আমি তো বুঝতেই পারছি না, রাজকন্যা, তোমার মতো অত সুন্দর কেউ অমন মনখারাপ ক'রে আছে কেন ; কারণ, আমি যদিও হলফ ক'রে বলতে পারি, সুন্দরী তো আমি খুব-একটা কম দেখিনি, কিন্তু তোমার ধারে-কাছে আসতে পারে এমন রূপসী আমি কোথাও দেখিনি।'

'তুমি তো সৌজন্য দেখিয়ে অমন কথা বলবেই,' উত্তর দিলে রাজকন্যা, আর সেখানেই সে থেমে গেলো।

'সৌন্দর্য,' রিকি যার ওই লম্বা টিকি ব'লে চললো, 'এমন-এক সম্পদ যা নিশ্চয়ই সমস্ত অভাবই পূরণ ক'রে দেয়। আর যখন কেউ ওই রূপের ঐশ্বর্যে ভরপুর হ'য়ে আছে, আমি তো বুঝতেই পারি না সে এমন করুণ মুখ ক'রে দুঃখ করবে কেন।'

'আমি বরং,' রাজকন্যা বললে, 'তোমার মতো কিম্ভূত বা বিশ্রী হ'তে পারলেই খুশি হবো, যদি তখন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু গজায়। রূপের বদলে আমার মাথায় কিছুটা বুদ্ধি থাকলেই আমি খুশি হতুম।'

'কারু যে বুদ্ধি আছে সেটা কিন্তু—সে যদি বলে তার মগজে ঘিলু ব'লে কিছু নেই একটুও—তবেই প্রমাণ হ'য়ে যায়। বুদ্ধির ব্যাপারটাই এমন যে যার যতই বুদ্ধি থাক তার ততই তার অভাব বোধ হ'তে থাকে।'

'সে-কথা তো কখনও শুনিনি,' রাজকন্যা বললে, 'তবে আমি এটা জানি যে আমি একটা আস্ত গবেট, আর সেইজন্যেই আমি এত কষ্ট পাচ্ছি।'

'শুধু এটুকুই যদি তোমার কষ্টের কারণ হয়, রাজকন্যা, তবে আমি এক্ষুনি তা ঘুচিয়ে দিতে পারি।'

'আর কেমন ক'রে তুমি এই অসাধ্যসাধন করবে?' রাজকন্যা জিগেস করলে।

'আমার সেটুকু ক্ষমতা আছে,' বললে রিকি ওরফে লম্বাটিকি, 'আমি যাকে সবচেয়ে ভালোবাসবো তাকে আমি জগতের সব বুদ্ধিবিবেচনা কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে দিতে পারবো, আর যেহেতু তুমি রাজকন্যা, সেই ভালোবাসার ধন, এখন তুমি জগতের যত বুদ্ধি চাও সব পেয়ে যেতে পারো, যদি একবার বলো যে আমায় তুমি বিয়ে করবে।'

রাজকন্যা তো একেবারেই হতবাক, কী-যে ব'লে ওঠা যায় কিছুই তার মাথায় খেললো না।

'দেখছি,' ঠিকই যার লম্বাটিকি সেই রিকি বললে, 'মন থেকে তুমি প্রস্তাবটায় সায় দিতে পারছো না, আর তাতে আমি একটুও অবাক হইনি। তবে তোমার মনস্থির ক'রে নেবার জন্যে আমি তোমায় গোটা একটা বছর সময় দিতে রাজি আছি।'

রাজকন্যার মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই, অথচ সাধ যে তার যেন কিছুটা বুদ্ধি হয়, সে ভেবেই নিলে বছরের শেষ তো আর কোনোদিনই আসবে না, আর সে তক্ষুনি ওই প্রস্তাবটায় রাজি হ'য়ে গেলো।

যেই সে লম্বাটিকি রিকিকে কথা দিলে যে সে তাকে এক বছর পরে বিয়ে করতে রাজি আছে, অমনি তার মনে হ'তে লাগলো সে যেন কেমন অন্যরকম কোনো মানুষ হ'য়ে যাচ্ছে। সে দেখতে পেলে তার মাথায় যা আসে তা-ই ব'লে ফেলতে এখন তার একটুও বাধো-বাধো ঠেকছে না, আর কথাটা সে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে সহজ সাবলীলভাবে ব'লে ফেলতে পারে। সে তক্ষুনি রিকি যার ওই লম্বাটিকির সঙ্গে বুদ্ধিমতীর মতো বেশ খুনশুটি ক'রে ঠাট্টাতামাশা ক'রে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলে, আর তার কথা বলার ভাবভঙ্গি দেখে রিকির ভয় হ'লো নিজের জন্যে ছিটেফোঁটাই শুধু রেখে দিয়ে সে তাকে তার সব বুদ্ধি দিয়ে ফেলেছে কি না।

রাজকন্যা যখন ফিরে এলো, কেউ আঁচই করতে পারলে না আচমকা তার এখন আশ্চর্য ও অসাধারণ বদল হ'য়ে গেলো কী ক'রে, কারণ আগে সে যতটা গবেট ছিলো এখন সে ততটাই সরস বুদ্ধিদীপ্ত কাণ্ডজ্ঞান দেখাতে শুরু করেছে। সারা রাজদরবারই একেবারে আনন্দে ফেটে পড়ে আর-কি! কেবল তার ছোটো বোনটিই মোটেই খুশি হয়নি, কারণ অ্যাদ্দিন সে তার ওপর খবরদারি চালিয়েছিলো তার বুদ্ধির খেল দেখিয়ে, আর এখন বোনের পাশে তার নিজেকেই মনে হচ্ছে বদখত বিতিকিচ্ছিরি আলুথালু কোনো মেয়ে ব'লে।

এখন রাজাই তার পরামর্শ নিয়ে রাজকারবার করেন, মাঝে-মাঝে এমনকী মেয়ের ঘরেই তাঁর মন্ত্রণাসভা বসিয়ে দেন। এই আশ্চর্য বদলের গুজবটা শিগ্‌গিরই চারধারে ছড়িয়ে পড়লো, আর আশপাশের রাজ্যের সব তরুণ রাজপুত্ররাই তার দাক্ষিণ্য পাবার জন্যে নিজেদের মধ্যে জোর লড়াই বাঁধিয়ে দিলে, তাদের প্রায় সব্বাই এখন তার পাণিপ্রার্থনা করতে লেগেছে। রাজকন্যার কিন্তু কাউকেই মনে ধরলো না—খুব-যে সরস বুদ্ধি-শুদ্ধি কারু আছে এমনটা মোটেই মনে হ'লো না, কথাটি না-ক'য়ে সে শুধু সকলের সব কথাবার্তা শুনে গেলো।

তবে শেষটায় এমন-একজন এলো, সে এত ক্ষমতাবান ধনী বুদ্ধিমান আর সুপুরুষ যে রাজকন্যা নিজেকেই বোঝাতে লাগলো তার মনে বুঝি এর জন্যে একটু টান জ'ন্মে গিয়েছে। তার বাবাও এটা খেয়াল করলেন আর তাকে ব'লে দিলেন সে কাকে বিয়ে করবে এটা শুধু তার রুচির ওপরই নির্ভর করে, তাকে শুধু মুখ ফুটে বললেই হবে কাকে তার মনে ধরেছে। কিন্তু কেউ যতই বুদ্ধিমান হয়, ততই তার মুশকিল হয় কোনো-একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছুতে। তো, সেইজন্যেই, সে বাবাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললে সে একটু ভেবে দেখবার সময় চায়।

তার কী করা উচিত, সে নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাববার জন্যে সে গেলো হাঁটতে-হাঁটতে হবি তো হ সেই বনটাতেই যেখানে তার সঙ্গে রিকি যার ওই লম্বাটিকির দেখা হয়েছিলো। সে হেঁটেই চলেছে, চিন্তাকুল, যখন সে শুনতে পেলে তার পায়ের তলা থেকে কাদের যেন জড়ানো চাপা গলা ভেসে আসছে—যেন একদল লোক শশব্যস্তভাবে তাড়াহুড়ো ক'রে এদিক-ওদিক চলেছে। ভালো ক'রে শুনতে গিয়ে তার কানে কার যেন গলা ভেসে এলো—'আমাকে ওই সুরুয়ার বাটিটা এনে দাও তো কেউ', আরেকজন বলছে : 'কড়াইটা আমার হাতে দাও দেখি,' আর অন্য-একজন : 'চুল্লিতে কিছু কাঠখড় গুঁজে দাও।' আর ঠিক তখনই তার পায়ের কাছে মাটি দু-ভাগ হ'য়ে খুলে গেলো, আর সে দেখতে পেলে মস্ত এক রসুই ঘর, বাবুর্চি খানশামা চাপরাশিতে সে এক হুলুস্থূল কাণ্ড, সবাই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে এক বিশাল ভোজের আয়োজন করছে ; বিশ-ত্রিশ জন তন্দুর রাঁধুনি কুচকাওয়াজ ক'রে এগিয়ে এসে বনবীথির মাঝখানে খুব লম্বা একটা টেবিল ঘিরে দাঁড়ালে, আর বিশাল-বিশাল সব শিক নিয়ে—তাদের মাথায়

শেয়ালের লোমের টুপি—তারা একসঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ শুরু ক'রে দিলে আর কাবাব বানাতে-বানাতে তারা তালে-তালে একটা গানে গলা মেলালে।

দৃশ্য দেখে রাজকন্যা তো থ, জিগেস করলে কার জন্যে তারা কাজ করছে।

'কেন, সাহেবান,' এদের মধ্যে যে মুরুব্বি গোছের সে বললে : 'রিকি যার ওই লম্বা টিকি তাঁর জন্যে। কাল তাঁর বিয়ে যে!'

রাজকন্যা তো আগের চেয়েও আরো অবাক হ'লো, আর আচমকা তার মনে প'ড়ে গেলো, আরে, আজই তো কাঁটায়-কাঁটায় এক বছর হ'লো, সেই যখন সে রিকি যার ওই লম্বা টিকি তাকে বিয়ে করবে ব'লে কথা দিয়েছিলো, আর অমনি সে তার শরীরের খোলের মধ্যে থেকেই লাফিয়ে বেরিয়ে আসে প্রায়। কেন-যে এর আগে কথাটা তার মনে পড়েনি! তার কারণ হ'লো—সেই যখন সে ওই কথা দিয়েছিলো সে তখনও ছিলো ভারি বোকাশোকা ; আর এখন যখন তার বুদ্ধিশুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে, ওই রাজকুমারই তো বুদ্ধিশুদ্ধি তার মগজে চালান ক'রে দিয়েছিলো, তার দরুন সব বোকাশোকা ভাবনাই এখন তার মগজ থেকে লোপাট হ'য়ে গিয়েছে।

সে আরেকটু দূরে গেছে কি না-গেছে, হাঁটতে তো বেরিয়েছে সে, হঠাৎ তার সামনে এসে উদয় হ'লো খোদ রিকি, যার ওই বিদঘুটে লম্বা টিকি, দারুণ সাজপোশাক গায়ে, ফিটফাট, যেন কোনো রাজপুত্র তার বিয়েয় চলেছে।

'দেখতে পেলে তো, রাজকন্যা,' সে বললে, 'আমি কেমন কাঁটায়-কাঁটায় সময় মেপে সবকিছু করি। আর আমার কোনো সন্দেহই নেই তুমিও তোমার কথা রাখতেই এখানে এসে হাজির হয়েছো, আর আমায় বিয়ে ক'রে তুমি আমার জগতের সবচেয়ে সুখী মানুষ ক'রে দিতে চাচ্ছো।'

'সিধে কথাটাই তোমায় রাখ-ঢাক না-ক'রে বলি,' রাজকন্যা বললে, 'আমি এখনও কিন্তু প্রস্তাবটা নিয়ে কোনোকিছু স্থির ক'রে নিতে পারিনি, আর আমার মনে হয় না আমি কখনও তোমার ইচ্ছে মতো কাজটা ক'রে উঠতে পারবো।'

'তুমি আমায় তাজ্জব ক'রে দিলে দেখছি,' বললে রিকি যার ওই লম্বা টিকি।

'তা-ই আমি ভেবেছিলুম,' রাজকন্যা বললে, 'আর, স্বভাবতই, আমাকে যদি অভদ্র ইতর লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হ'তো, ওই যার কোনো কাণ্ডজ্ঞান বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, তবে আমার লজ্জায় একেবারে মাথা কাটা যেতো। "কোনো রাজকন্যার মুখের জবানের কোনো নড়চড় হয় না", ওই অঘামার্কা বলতো, "আর আমাকে তোমায় বিয়ে করতেই হবে, কারণ তুমি তো আমায় জবান দিয়েছো।" কিন্তু আমি যার সঙ্গে কথা কইছি সে তো জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ, আমি ঠিক জানি সে যুক্তির কথায় কান পাতবে। তুমি জানো যে আমি যখন একেবারে গবেট ছিলুম আমি তোমায় বিয়ে করবো কি না কিছুতেই মনস্থির ক'রে উঠতে পারিনি। আর তুমি আমায় যে বুদ্ধিশুদ্ধি দিয়েছো, তাতে আমি আরো খুঁতখুঁতে হ'য়ে উঠেছি, এখন কী ক'রে আজ আমি দুম ক'রে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি—যে সিদ্ধান্ত কি না সেই তখন আমি নিতে পারিনি। সত্যি যদি ঠিক-ঠিকই বিয়ে করতে চেয়ে থাকো তবে আমার সমস্ত বোকামি হঠিয়ে দিয়ে আমাকে এখন সবকিছু ঠিকঠাক দেখবার চোখ দিয়ে মস্ত ভুল করেছো।'

'যদি, এইমাত্র তুমি যা বললে,' রিকি যার ওই বিদঘুটে লম্বাটিকি বললে, 'যদি তুমি ভেবে থাকো এক নিরেট অঘামার্কা লোকই তোমার জবান না-মানার জন্যে বকাঝকা করতে পারে, এবং তুমি বুঝি আশা করো যে আমি সে-রকম কিছুই করবো না, যখন আমার সারা জীবনের সুখশান্তি কিনা শুধু এরই ওপর নির্ভর

ক'রে আছে! যাদের একফোঁটাও বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তারা বুঝি হাবাগোবাদের চাইতেও কম কিছু পেয়ে দিলখুশ থাকবে? তুমি কি এটাই বলতে চাও যে যে-তোমার এত-সব আছে এবং যদি চাও সেই সবই তোমারই থাক চিরকাল—তবে তেমনটা হবে বুঝি? সরাসরি মূল কথাটায় আসবার অনুমতি দাও আমাকে। বিচ্ছিরি চেহারাটা ছাড়া আর-কিছু কি আছে আমার, যা তোমার অরুচিকর ঠেকে? তুমি কি আমার বনেদিয়ানা, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি, আমার স্বভাবচরিত্র বা আমার ব্যবহার থেকে অসন্তোষের কিছু পেয়েছো?

'না, না, মোটেই না,' রাজকন্যা বললে, 'তুমি যা-যা বললে, তার সবকিছুই আমার মনের মতো।'

'তবে, সেক্ষেত্রে,' বললে রিকি যার ওই লম্বা টিকি, 'আমি চিরসুখী হ'য়ে উঠবো, কারণ একমাত্র তুমিই আমাকে জগতের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মানুষ বানিয়ে দিতে পারো।'

'তা কেমন ক'রে হবে?' জিগেস করলে কৌতূহলী রাজকন্যা।

'তা হবে,' রিকি যার ওই লম্বা টিকি বললে, 'যদি তুমি আমায় ভালোবেসে সেটাই কামনা করো। আর তোমার সব দ্বিধার ইতি টেনে দেবার জন্যে তোমাকে এই কথাটি খুলে বলতে দাও—সেই যে-পরি আমার জন্মদিনে ওই অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলো যাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসবো তাকে আমি মর্জিমাফিক সব বুদ্ধি দিয়ে দিতে পারবো, যদি তুমি তাকেও অর্থাৎ আমাকেও তার বদলে কিঞ্চিৎ বদান্যতা দেখাও আর কোনোকিছু দিতে আগ্রহী হও।'

'মামলাটা যদি তা-ই হয়,' রাজকন্যা বললে, 'আমি চাই যে জগতের সব রাজপুত্রের মধ্যে তুমি যেন সবচেয়ে সুপুরুষ আর মনোলোভা হ'য়ে ওঠো। যদি আমার মধ্যে কোনো ক্ষমতা আদপেই থেকে থাকে, তবে আমি তোমাকে সেই ভেটটাই দিচ্ছি, সেটাই আমার উপহার।'

রাজকন্যা তার মুখ থেকে কথাগুলো খসিয়েছে কি খসায়নি, রিকি যার ওই বিদঘুটে লম্বা টিকি তার চোখে জাতের সবচেয়ে-সুপুরুষ সবচেয়ে-মনোহারী সবচেয়ে-বাঞ্ছিত মানুষ হ'য়ে উঠলো—এমন অপরূপ সুপুরুষ আগে সে কখনোই দ্যাখেনি।

অনেকেই ব'লে থাকে ওই বদল এসেছিলো পরির মায়ায় নয়, শুধু ভালোবাসারই টানে। তারা বলে যে রাজকন্যা তার প্রেমিকের ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা আর হৃদয় মন আত্মার সব গুণ আবিষ্কার ক'রে তাকে কিম্ভূত কিমাকার কদাকার মূর্তি হিশেবে দ্যাখেনি : তার কুঁজটা হ'য়ে উঠেছিলো তার চোখে একটু ঝুঁকে চলবার শোভন সুন্দর ভঙ্গি, আর অ্যাদ্দিন সে যে একটু লেংচে-লেংচেই হাঁটতো সেটা এখন তা তার চোখে মনে হ'লো চলার সময়ে ছন্দের এক দোলা, আর সেটা তাকে মুগ্ধ ক'রে দিলে। তারা আরো বলে যে তার চোখ দুটো ছিলো একটু ট্যারা, এখন তার মনে হয় সেই জন্যেই তারা অমন ঝলমল করে; আর আগে যাকে কোঁচকানো ভুরু ব'লে ভাবতো এখন সেটাই হ'য়ে উঠেছে তার সব আবেগের প্রতিচ্ছবি; এমনকী তার ওই বিশাল লম্বা লাল নাসিকার ডগায় সে আবিষ্কার করলে শৌর্যবীর্যের চিহ্ন।

সত্য যা-ই হোক, রাজকন্যা ওইখানে দাঁড়িয়েই তক্ষুনি কথা দিয়ে দিলে যে সে তাকেই বিয়ে করবে, অবশ্য তাকে গিয়ে তার বাবার কাছ থেকে সম্মতি আদায় ক'রে নিতে হবে। রাজা যখন জানতে পেলেন যে তাঁর মেয়ে রিকি—যার ওই বিদ্ঘুটে লম্বা টিকি—সম্বন্ধে এত ভালো-ভালো সব কথা ভাবে, এবং যার সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য সূত্র থেকে জেনেছেন যে তার মতো অত জ্ঞানীগুণী বুদ্ধিমান রাজপুত্র আর হয় না, তিনি তখন তাকে রাজবাড়ির জামাই হিশেবে অভ্যর্থনা জানালেন। পরদিনই বিয়ে হ'য়ে গেলো ধুমধাম ক'রে, ঠিক যেমনটা রিকি যার ওই লম্বা টিকি আগে থেকেই মনশ্চক্ষুতে দেখেছিলো, এবং যার কথা ভেবে সে তার লোকজনকে আগে থেকেই সব সুব্যবস্থা করবার হুকুম দিয়ে রেখেছিলো।







বুড়ো আংলার লম্পঝম্প

এক-যে ছিলো কাঠুরে আর তার বউ, তাদের দুজনের সাতটি বাচ্চা হয়েছিলো, সব্বাই ছেলে। বড়োজনেরই বয়েস মাত্র দশ, আর ছোটোটির বয়েস সাত। অত অল্পদিনের মধ্যেই অতগুলো কাচ্চাবাচ্চা হয়েছিলো শুনলে একটু তাজ্জবই লাগে বৈ কি, কিন্তু তার বউ বিশ্বাস করতো যে যা করার চট ক'রেই সেরে ফ্যালো, আর একেকবারে তার কখনও দুটির চেয়ে কম ছেলে হয়নি।

তারা ছিলো এতই গরিব যে তাদের ওই সাত-সাতজন ছেলে মস্ত একটা বোঝা হ'য়ে উঠেছিলো তাদের কাছে, কারণ ছেলেগুলো এতই ছোটো যে এখনও কিছু কামাবার মতোই হয়নি। ব্যাপারটাকে আরো-খারাপ ক'রে তুলেছিলো ছোটোটি, সে ছিলো একেবারে হালকা-পাতলা, আর জ'ন্মে অব্দি সে একটি কথাও কয়নি, আর যদিও এটা ছিলো সত্যি-সত্যি বুদ্ধিমানেরই লক্ষণ, তারা কিন্তু এটা কোনো হাবা-গোবা বোকারই চিহ্ন ব'লে ধ'রে নিয়েছিলো। সে ছিলো খুদে, একরত্তি, আর সে যখন প্রথম পৃথিবীতে তার চোখ মেলে তাকিয়েছিলো তখন সে তোমার বুড়ো আঙুলটার চেয়েও বড়ো ছিলো না, ফলে তার নামটাই হ'য়ে উঠেছিলো *ক্যাংলা কাঠি বুড়ো আংলা।*

এই বেচারা ছেলেটিই পরিবারের সকলের রঙ্গ-রসিকতার পাত্র হ'য়ে উঠেছিলো। সে যা-ই করতে

যেতো সব ভুলভাল ক'রে গোল বাঁধিয়ে বসতো। অথচ ভাইদের মধ্যে সে-ই কিন্তু ছিলো সবচেয়ে চালাকচতুর আর তার মাথায় ছিলো শানানো বুদ্ধি, আর কথা যদিও প্রায় বলেই না, ড্যাবডেবে চোখ মেলে সবকিছুই কিন্তু সে তাকিয়ে-তাকিয়ে খেয়াল করে।

এলো এক মহা দুর্দিন! দুর্ভিক্ষটা এমনই সাংঘাতিক ছিলো যে গরিবগুর্বোরা তাদের কাচ্চা-বাচ্চাদের দূর ক'রে দেবে ব'লেই ঠিক করলে। এক সন্ধ্যায় বাচ্চারা যখন গিয়ে শুয়ে পড়েছে আর কাঠুরে আর তার বউ চুল্লির কাছে ব'সে-ব'সে হাত-পা সেঁকছে, কাঠুরে ভাঙা-ভাঙা স্বরে কষ্টের সুরে বললে :

'দেখতেই তো পাচ্ছো বাচ্চাগুলোর মুখে আজকাল খুদকুঁড়োও তুলে দিতে পারছি না। চোখের সামনেই এক-একজন খিদের জ্বালায় পটোল তুলবে, এ-দৃশ্য আমি সইতেই পারবো না। তাই ঠিক করেছি ওদের গহন বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হারিয়ে চ'লে আসবো। কাজটা সহজই হবে, কারণ তারা তো সবাই কাঠকুটো কুড়িয়ে জড়ো করতে থাকবে, আমরা ওদের নজর এড়িয়েই সকলের অগোচরে চট ক'রে কেটে পড়তে পারবো।'

'হায়-হায়!' কাঠুরের বউ হা-হা ক'রে উঠলো। 'তুমি তোমার নিজের ছেলেগুলোকে সাথে ক'রে নিয়ে ইচ্ছে ক'রে হারিয়ে আসতে পারবে কী ক'রে?'

তার বর তখন কেবলই তাদের ওই বিষম দারিদ্র্যের কথা তোলে, বারে-বারে সে নিয়ে সাত কাহন শোনায়, কিন্তু তার বউ তাতে কিছুতেই সায় দেবে না। সে গরিব হ'তে পারে, কিন্তু সে-ই তো ছেলেগুলোকে পেটে ধরেছে, সে যে তাদের মা।

শেষটায়, অবশ্য, যখন তার মাথায় ঢুকলো যে ছেলেগুলো যখন তার চোখের সামনেই খিদের জ্বালায় ম'রে যাবে, তখন সে তার বরের কথায় রাজি হ'লো আর চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

ওই ক্যাংলা কাঠি বুড়ো আংলা কিন্তু সব কথাই শুনতে পেয়েছিলো, কারণ বিছানায় শুয়ে সে যখন টের পেলে যে তার মা-বাবা খুবই গুরুতর-কিছু নিয়ে আলোচনা করছে, সে বিছানা ছেড়ে উঠে প'ড়ে পা টিপে-টিপে গিয়ে তার বাবার জলচৌকির তলায় সেঁধিয়ে পড়েছিলো, সেখানে কুঁকড়ে-মুকড়ে ব'সে সে সবকিছুই শুনতে পাবে, অথচ কেউই তাকে দেখতে পাবে না। সব কথা শুনে-টুনে সে বিছানায় গিয়ে শুলো বটে, কিন্তু বাকি রাতটা কিছুতেই তার দু-চোখের পাতা এক করতে পারলে না, সারাক্ষণ শুধু এ-কথাই ভাবলে এখন তার কী করা উচিত।

খুব ভোরেই সে উঠে পড়লো, আর একটা ছোটো নদীর সোঁতার ধারে গিয়ে হাজির হ'লো, সেখানে সে পাড়ে ব'সে ছোটো-ছোটো শাদা নুড়িতে তার পকেট বোঝাই ক'রে ফেললে, তারপর বাড়ি ফিরে এলো, সে যে কী কথা আড়ি পেতে শুনতে পেয়েছে সে সম্বন্ধে সে তার দাদাদের কাছে একটা কথাও কইলে না।

তারা গিয়ে জঙ্গলের এমন-একটা জায়গায় পৌঁছুলো, যেখানে গাছপালাগুলো এতই ঘননিবিড় যে দশ হাত দূরেও কাউকে দেখা যায় না। কাঠুরে তার কুড়ুলের কোপ মেরে কাঠ কাটতে শুরু করলে, আর বাচ্চারা ব্যস্ত রইলো লতা কুড়োতে, যাতে চেলা কাঠগুলো আঁট ক'রে বেঁধে নিতে পারে। বাবা-মা যখন দেখতে পেলে ছেলেগুলো এখন এক মনে মাথা নিচু ক'রে তাদের কাজ ক'রে যাচ্ছে, তারা পা টিপে-টিপে তাদের কাছ থেকে স'রে গেলো, তারপর একসময় হুড়মুড় ক'রে পাশের একটা শুঁড়িপথ দিয়ে কেটে পড়লো।

ছেলেরা যখন আবিষ্কার করলে যে তারা ছাড়া আশপাশে আর-কেউ নেই, তারা একেবারে একা, তারা হাউ-হাউ জুড়ে দিলে, গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে শুরু করলে। বুড়ো আংলা তাদের প্রাণ ভ'রে হল্লাগুল্লা করতে দিলে, সে তো জানে তারা তো বাড়ি ফিরে যেতে পারবেই, কারণ আসার সময় সে তার পকেট ভর্তি ওই শাদা নুড়িগুলো একটা-একটা ক'রে ফেলতে-ফেলতে এসেছে, যাতে পথের একটা খেই পাওয়া যায়। সে তার দাদাভাইদের বললে :

'ভয় পাসনে। বাবা-মা আমাদের এখানে ছেড়ে রেখেই চ'লে গেছে বটে, কিন্তু আমি তোদের বাড়ির পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো—কোনো গোল হবে না, দেখিস। শুধু আমার পেছন-পেছন আয়।'

তারা তা-ই করলে, আর বুড়ো আংলা জঙ্গলে তারা যে-পথ ধ'রে এসেছিলো তাদের সেই একই পথ ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে এলো তাদের কুঁড়েবাড়িতে। গোড়ায় তারা তো সাহসে বুক বেঁধে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই পারেনি, শুধু ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো দোরের বাইরেটায়, কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছিলো ঘরের মধ্যে তাদের মা-বাবা কী কথা বলাবলি করছে।

ঠিক যখন কাঠুরে আর তার বউ বাড়ি এসে পৌঁছেছে, জমিদার বাড়ি থেকে এক ভৃত্য এসে তাদের হাতে দশ-দশটা মোহর তুলে দিলে, অনেকদিন ধ'রেই জমিদার মশাই তাদের কাছে ওই টাকা ধারতেন, এতদিন ধ'রে, যে তারা যে কখনও যে দূর থেকেও সে-টাকা দেখতে পাবে, তার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলো। এই টাকা তো তাদের যেন নতুন জীবন দিলে, কারণ এই গরিব বেচারারা তো খিদেয় হন্যে হ'য়ে মরতেই বসেছিলো। কাঠুরে তক্ষুনি তার বউকে পাঠালে কশাইখানায়। এতদিন ধ'রে তারা কোনোকিছুই খায়নি, সেইজন্যে তার বউ দুজনের জন্যে যতটা লাগে তার চেয়ে তিনগুণ বেশি মাংস কিনে নিয়ে ফিরে এলো। যখন তারা অনেক দিন পরে পেট পুরে কিছু খেয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেলছে, বউ বললে :

'হায়-রে! ওই কচি বাচ্চাগুলো যে এখন কোথায়? এত মাংস বেঁচেছে যে তারা এখন এক চমৎকার ভোজ সেরে নিতে পারতো। এটা কিন্তু তুমি ভুলো না, উইলিয়াম, বনের মধ্যে ওদের হারিয়ে আসার ফন্দিটা কিন্তু তোমার মগজ থেকেই বেরিয়েছিলো। আমি তখন পই-পই ক'রে তোমায় বলেছিলুম, দেখো, এইজন্যে পরে তোমায় পস্তাতে হবে? ওই জঙ্গলের মধ্যে ওদের যে এখন কী হচ্ছে! হায়-হায়, হয়তো নেকড়েগুলো এরই মধ্যে তাদের খেয়ে ফেলেছে! সত্যি, নিজের ছেলেদের ওভাবে ফেলে রেখে চ'লে-আসা তোমার নিষ্ঠুরতারই পরিচয়!'

শেষটায় কাঠুরে তার বদ মেজাজ আর সামলে রাখতে পারলে না, কারণ তার বউ তো সত্যি পই-পই ক'রে বলেই ছিলো পরে এজন্যে তাদের অনুতাপ করতে হবে। সে হাউমাউ ক'রে বললে যদি চুপ না-করে তো সে তার বউকে পিটিয়ে ছাতু ক'রে দেবে। এটা হয়তো ঠিক যে কাঠুরে নিজেই এখন তার বউয়ের চেয়েও বেশি ক'রে মনখারাপ ক'রে বসেছিলো, কিন্তু তার বউ তো তার মাথাটাই খারাপ ক'রে ছাড়বে, আর তাছাড়া সে তো ওই পুরুষদের দলেরই একজন যারা বলে মেয়েদের সবসময় কাণ্ডজ্ঞান রেখে পুরুষদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে, কিন্তু এটা তার ভাবতে ইচ্ছে করছিলো না এ নিয়ে আগেই তারা সাত সতেরো কত কথাই বলেছিলো।

কাঠুরের বউয়ের চোখ থেকে তখন দর-দর ক'রে জল গড়াচ্ছে : 'হায়, হায়-রে আমার কচিকাঁচা বাছারা! আমার ওই বেচারা বাচ্চাগুলো যে এখন কোথায়!'

শেষটায় সে এমন জোরে-জোরে কথাগুলো বললে যে ছোটোরা যারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করছিলো, তারা তার এই কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলে, আর সমস্বরে চেঁচিয়ে

বললে :

'এই-যে! আমরা সবাই এইখানেই!'

কাঠুরের বউ যেন উড়ে গিয়ে পড়লো তাদের ওপর, তাদের চুমু খেতে-খেতে চেঁচিয়ে উঠলো :

'ওরে বাছারা, তোদের দেখতে পেয়ে আমি যে কত খুশি হয়েছি, কী বলবো! ঈশ! তোদের মুখগুলো যে শুকিয়ে একেবারে আমশি হ'য়ে গেছে—কত ধকল গেছে তোদের ওপর, আর খিদেয় নিশ্চয়ই একেবারে ঘায়েল হ'য়ে গিয়েছিস! আর তুই, ওরে পিটার, দ্যাখ, তোর গায়ে কত নোংরা লেগে আছে! কাছে আয়, তোকে ধুয়েমুছে সাফ ক'রে দিই!'

এই পিটার হ'লো তার সবচেয়ে বড়ো ছেলে, আর তাকেই সে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, কারণ তার চুল ছিলো সোনালি, আর তার নিজের চুলও তো একটু সোনালি। তাছাড়া পিটার তো সব সময়েই এত চাঙ্গা আর চনমনে থাকে যে মনে হয় সে যেন সারাক্ষণই উৎসাহে টগবগ ক'রে ফুটছে!

তারপর তারা গিয়ে বসলো খাবার টেবিলে, আর এমন হাউ-হাউ ক'রে তারিয়ে-তারিয়ে খেলো যে তাদের বাবা-মা তা-ই দেখে ভারি খুশি ; আর খেতে-খেতে তারা সাত কাহন ক'রে শোনালে বনের মধ্যে তাদের যে কী ভীষণ ঝামেলাই না গেছে! আর সব্বাই প্রায় একসঙ্গেই হইচই ক'রে কথা বলতে চাচ্ছে। আবার ছেলেদের ফিরে পেয়ে এই সহজসরল কাঠুরে দম্পতি সত্যি কিন্তু খুশিতে ডগমগ হ'য়ে উঠেছিলো, তবে তাদের ওই আহ্লাদ শুধু ততদিনই বজায় রইলো যতদিন এই দশ মোহরের ছিটেফোঁটাও হাতে ছিলো। কিন্তু যখন শেষ কড়িটাও গেলো, আবার তারা তাদের পুরোনো দুর্গতিতে হাবুডুবু খেতে লাগলো, আর আবারও ঠিক ক'রে নিলো তাদের নিয়ে ফের বনের পথে হারিয়ে আসবে। কোনো ভুল যাতে না-হয় সেইজন্যে তারা আগের বারের চাইতেও গহন বনের ঢের দূরে নিয়ে চ'লে গেলো।

এ-সব কথা তারা অবশ্য এমন গোপনে ও চুপিসাড়ে সারতে পারেনি যে বুড়ো আংলা তা আড়ি পেতে শুনতে পারবে না ; সে ঠিক করলে আগের বারের মতোই একই কায়দায় সে তার দাদাভাইদের ফের বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু যদিও রাত থাকতে-থাকতেই সে ছোটো নদীর পাড় থেকে নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে আসবে ব'লে ভেবেছিলো, হতাশায় ভ'রে গিয়ে সে আবিষ্কার করলে যে তাদের কুঁড়ে ঘরের দরজায় ছিটকিনি দেয়া, খিল আঁটা, এমনকী চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করা। বুড়ো আংলা তো বুঝতেই পারলে না সে এখন কী করবে। তারপর ছোটোহাজরির সময় কাঠুরের বউ যখন তাদের হাতে একটুকরো ক'রে রুটি তুলে দিলে, তখন তার মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেলো : নুড়ির বদলে সে তার হাতের রুটিটাই কাজে লাগাবে, রুটির টুকরো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পথে ছড়িয়ে দেবে। তো সেই জন্যেই রুটিটা সে খুব সাবধানে তার পকেটে রেখে দিলে।

বাবা-মা তাদের বনের একেবারে ঘন আঁধারঘেরা তল্লাটটায় নিয়ে গিয়ে পাশেরই একটা সরু শুঁড়িপথ দিয়ে চটপট স'রে পড়লো, তাদের ওই জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে রেখেই। বুড়ো আংলা কিন্তু মোটেই কোনো দুর্ভাবনা করেনি, কারণ তার ধারণা ছিলো আসার সময় পথের পাশে সে যে রুটির টুকরোগুলো ছড়িয়ে রেখে এসেছে, সে-সব দেখে-দেখেই সে তার দাদাভাইদের নিয়ে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু যখন রুটির একটা টুকরোও তার চোখে পড়লো না তখন সে একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। পাখিরা এসে তার সব রুটির টুকরোই খেয়ে গেছে।

তো এবার তারা সব্বাই ভীষণ ঘাবড়ে গেলো, মুষড়ে পড়লো। যতই তারা হাঁটলো, ততই তারা ফেরার পথ হারিয়ে আরো দূরে চ'লে গেলো, একেবারে জঙ্গলের সবচেয়ে ঘনজটিল অন্ধকারে। এদিকে রাত

নেমে এলো, আর হা-হা ক'রে ব'য়ে গেলো উদ্দাম এক হাওয়া—আর তাতে তারা তো আতঙ্কে একেবারে জড়োশড়ো। প্রতি মুহূর্তেই তাদের মনে হ'তে লাগলো এই বুঝি তারা নেকড়েদের গরগর শুনতে পাচ্ছে। ওই তারা বুঝি এসেই পড়লো তাদের খেয়ে ফেলতে। টুঁ শব্দ করার সাহস হচ্ছিলো না তাদের তো কথা বলবে কী! পেছন ফিরে তাকাতেও সাহস হয় না। তারপর ঝমঝম ক'রে নেমে পড়লো মুষল ধারে বৃষ্টি, জামাকাপড় সব ভিজে একশা। এক পা এগুলেই পিছলে প'ড়ে যায় এককেজনে, কাদার মধ্যে গভীর গাড্ডায় প'ড়ে যায় তারা, উঠে যখন দাঁড়ায় জলে-কাদায় গা-হাত-পা মাখা, বিশেষ ক'রে হাঁটু আর কনুইগুলো কাদায় চটচট করছে।

বুড়ো আংলা একটা গাছে উঠে গেলো তরতর ক'রে, উঁচু থেকে তাকিয়ে দেখবে পথের কোনো চিহ্ন দেখা যায় কি না, বোঝা যায় কি না তারা ঠিক কোথায় আছে। সব দিকেই ভালো ক'রে তাকাবার পর একবার তার চোখে পড়লো ছোট্ট একটা আলো, সম্ভবত কোনো মোমের আলোই হবে, কিন্তু সে তো অনেক অনেক দূরে, একেবারে বনের ওপাশে।

গাছ থেকে নেমে এলো সে, আর তারপর, এ কী আপদ, সে আবিষ্কার করলে : কোনো ক্ষীণ মিটমিটে আলোই সে আর দেখতে পাচ্ছে না। তবু, শেষবার যে-দিকটায় ওই আলো দেখা গিয়েছিলো, সেই দিকটার দিকে আন্দাজেই কিছুক্ষণ হাঁটবার পর, তারা আবার সেই অলোটাকে দেখতে পেলে, বনের শেষে।

শেষটায় তারা ওই আলো যেখানে জ্বলছে সেই বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছুলো, যদিও বেশ ক-বারই ভির্মি খাবার জোগাড় হয়েছিলো, কারণ মাঝে-মাঝেই বাতিটা নজর থেকে হারিয়ে যায়, আর বিশেষত তখনই সেটা ঘটে যখন তারা একটা ঢালের মধ্যে দিয়ে যায়। বাড়িটায় পৌঁছে তারা দরজাটায় টোকা দিলে, আর এক সহৃদয়া মমতাময়ীই দরজাটা খুলে দিলে, জিগেস করলে তারা কী চায়। বুড়ো আংলা সকলেরই তরফ থেকে বললে তারা পথ-ভোলা জনাকয়েক বেচারি ছেলে, বনের মধ্যে সব শুলুকসন্ধানই হারিয়ে ফেলেছে, যদি দয়া ক'রে তিনি তাদের শোবার জন্যে আজ রাত্তিরে কোনো বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দেন।

'হায়-রে! বেচারা! কোথায় এসে পৌঁছেছো জানো না? জানো না এটা এক রাক্ষসের বাড়ি, কচি-কচি ছেলেমেয়ে দেখলেই সে কপাৎ ক'রে খেয়ে ফ্যালে!'

'ও মা গো!' বুড়ো আংলা এ-কথা শুনেই তার ভাইদের মতোই থরহরি কাঁপতে লেগেছে, ভয়ে আত্মারাম তো খাঁচাছাড়া হবারই জোগাড়। 'এখন তাহ'লে আমরা কী করি, আপনি যদি ভেতরে আমাদের কোনো ঠাঁই না-দেন তো জঙ্গলের ওই নেকড়েগুলোই আজ রাতে আমাদের খেয়ে ফেলবে। আর, তা-ই যদি হয়, তো তার বদলে আমরা বরং চাইবো কোনো সুজন মহাজনই আমাদের খেয়ে ফেলুন। আপনি যদি তাঁকে জিগেস করেন তো আমাদের এমন বেহুঁশ বেহাল দশা দেখে তাঁর হয়তো দয়া হবে।'

রাক্ষসের বউটি ভাবলে হয়তো আজ রাতটার মতো তার স্বামীর নজর থেকে ছেলেগুলোকে সে সকাল অব্দি লুকিয়ে রাখতে পারবে ; আসুক তবে ওরা ভেতরে। একটা চুল্লিতে গনগন ক'রে আগুন জ্বলছিলো, বললে তার পাশে ব'সে তারা হাত-পাগুলো একটু সেঁকে নিক বরং ; সেই চুল্লির ওপর রাক্ষসের ভুরি ভোজের জন্যে গনগনে আঁচে একটা শিকে গাঁথা একটা আস্ত ভেড়াই ঝলসানো হচ্ছে।

তাদের যখন একটু-একটু গা গরম হ'য়ে যাচ্ছে এমন সময় দরজায় বেদম করাঘাতের আওয়াজ উঠলো; রাক্ষস এসে হাজির হয়েছে। তার বউ চটপট ছেলেগুলোকে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে দরজা খুলতে গেলো। ভেতরে ঢুকেই রাক্ষস জিগেস করলে খাবার তৈরি তো, পিপে থেকে বার ক'রে বোতলে শরাব ভরা হয়েছে তো? তারপর আর দেরি না-ক'রে সোজা গিয়ে বসলো খাবার টেবিলে। ভেড়ার মাংস কিন্তু

তখনও পুরোপুরি পাকানো হয়নি, আদ্ধেকটা কাঁচাই থেকে গেছে, অথচ সেই জন্যেই কিন্তু রক্ষকুলনিধি সেই মাংস খুব তারিয়ে-তারিয়ে খেলে। তারপরেই আশপাশে মুখ ফিরিয়ে ঘন-ঘন শ্বাস টেনে বললে, 'মানুষের গন্ধ পাঁউ ব'লে মনে হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই এটা ওই কচি বাছুরটার গন্ধ, আমি তো এটায় খুব ক'রে মশলা মাখাচ্ছি কি না,' বললে রাক্ষসপত্নী, 'তারই গন্ধ পাচ্ছো নিশ্চয়ই।'

'আমি তোমায় বলছি আমি ঠিক মানুষেরই গন্ধ পাচ্ছি,' রাক্ষসবীর আবার ওই একই কথা বললে, স্ত্রীর দিকে কেমন যেন কটমট ক'রে তাকিয়ে। 'কিছু-একটা ঘোঁট হচ্ছে নিশ্চয়ই এখানে, আমি তার মানে-টানে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই কথা ব'লে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে সটান বিছানার কাছে চ'লে গেলো।

'ওঃ!' রাক্ষস উবাচ, 'তুমি আমাকে এই ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছো বুঝি? বেইমান, তোমাকেই যে অ্যাদ্দিন আমি কেন পেটে চালান ক'রে দিইনি, তা-ই তো আমি বুঝে উঠতে পারি না। এমন দড়কচামারা শক্তপোক্ত এক মেয়ে ব'লেই এ-যাত্রায় তুমি বেঁচে গেছো। তা বেশ, বেশ, আমার তিন রাক্ষস দোস্ত আসবে, এই শিকার দিয়েই তাদের তোফা আপ্যায়ন করা যাবে—ওরা তো যে-কোনো সময়ই এখানে এসে পড়বে।'

খাটের তলা থেকে একজন একজন ক'রে ওদের সব্বাইকে সে টেনে বার করলে। বেচারি ছেলেগুলো হাউ-হাউ ক'রে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরলো, দয়া চেয়ে মাফ চেয়ে। কিন্তু এ তো ছিলো রাক্ষসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ; আর কোথায় সে তাদের ওপর দয়া দেখাবে, তার বদলে সে তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো দিয়েই প্রায় যেন গিলেই ফেলছিলো তাদের, আর তার বউকে বলছিলো ভালো ঝাল মশলা দিয়ে রাঁধলে এরা সব তোফা খেতে হবে।

মস্ত একটা ছুরি বার ক'রে আনলে সে, আর বেচারাদের কাছে এসে বাঁ হাতে ধরা একটা বিশাল পাথরের ওপর তার ছুরিটাকে শান দিতে লাগলো। এরই মধ্যে একজনকে সে বেছে নিয়ে তুলে ধরেছে; আর তার কাণ্ড দেখে তার বউ বললে :

'রাত্তির ক-টা বাজে সে-খেয়াল আছে? কাল ভোরবেলা উঠলে তোমার কাছে তো সারা দিনটাই প'ড়ে থাকবে।'

'চুপ করো,' রাক্ষস বললে। 'যতই তারা শিকে-গাঁথা উনুনের ওপর ঝোলানো থাকবে, ততই তারা মুখরোচক হ'য়ে উঠবে।'

'কিন্তু ভাঁড়ার ঘরে তো অত মাংস প'ড়ে আছে,' তার বউ তবু বোঝাবার চেষ্টা করলে। 'আছে একটা বাছুর, দুটো আস্ত ভেড়া, আর একটা বুনো বরার আদ্ধেকটাই।'

'হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিকই বলেছো,' সায় দিলে রাক্ষস। 'বেশ, এদের তবে একটু খেতে-টেতে দিয়ো, যাতে এরা বেশ নধর থাকে, তারপর বিছানায় শুইয়ে এদের ঘুম পাড়িয়ে দাও।'

মমতাময়ী বউটি তো খুব খুশি, সে তাদের জন্যে একটা ভুরিভোজেরই আয়োজন ক'রে ফেললে, কিন্তু এরা এতই ঘাবড়ে গিয়েছে যে খাবে কী, কুটোগাছটিও মুখে তুলতে পারছে না। আর রাক্ষস ততক্ষণে ফিরে গিয়েছে তার শরাবের বোতলটায়, তার ইয়ার দোস্তদের এমন তোফা খানা খাইয়ে আপ্যায়ন করতে পারবে ভেবেই তার দিল খুশ। সাধারণত যতটা খায়, তার চেয়েও এক ডজন বেশি গেলাস সে ঢকঢক ক'রে তার গলায় ঢাললে। আর সেটা শেষে যখন তার মাথাতেই চ'ড়ে গেলো, সে একরকম বাধ্য হ'য়েই

তখন শুতে চ'লে গেলো।

রাক্ষসের ছিলো সাত মেয়ে, তারা এখনও বেশ ছোটোই আছে। এই বাচ্চা রাক্ষুসিদের গায়ের রঙ যেন দুধে আলতায় মেশানো কারণ তারা তাদের বাবার মতোই মানুষের শরীরই পেয়েছে। কিন্তু তাদের চোখগুলো ছোটো-ছোটো কুতকুতে, নাকগুলো কেমন যেন বাঁকা-বাঁকা, ইয়া বড়ো-বড়ো মুখ, আর লম্বা-লম্বা ফাঁক-ফাঁক ধারালো দাঁত। তারা অবশ্য এখনও ঠিক জংলি হ'য়ে ওঠেনি, তবে তাদের হাবভাব দেখে মনে হয় শিগগিরিই তারা বন্য হ'য়ে উঠবে, কারণ তারা এর মধ্যেই কোলের ছানাদের রক্ত শুষে খেয়েছে।

আগেই তাদের বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছিলো, সাত জনই একসঙ্গে ঘুমুচ্ছিলো মস্ত একটা পালঙ্কে শুয়ে, সকলের মাথাতেই ছিলো একটা ক'রে সোনার তাজ। সেই ঘরেই ছিলো একই মাপের আরেকটা বড়ো পালঙ্ক, আর রাক্ষসের বউ সেই পালঙ্কেই ছোটো সাতটি ছেলেকেই শুইয়ে দিলে। তারপর সেও তার স্বামীর সঙ্গে তাদের বিছানায় শুয়ে পড়লো।

বুড়ো আংলার চোখ পড়লো যে রাক্ষসের মেয়েদের সকলের মাথাতেই একটা ক'রে সোনার তাজ পরানো ; রাক্ষস যদি এর পরেই আপশোশ করতে থাকে যে কেন সে প্রথম সন্ধ্যাতেই এদের জবাই করেনি, এই ভয়ে সে একটু ঘাবড়েই ছিলো ; মাঝ রাতের একটু আগেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো, চুপচাপ সে তার নিজের আর দাদাভাইদের মাথা থেকে টুপিগুলো খুলে রাক্ষসের মেয়েদের মাথায় পরিয়ে দিলে। কিন্তু তার আগে অবশ্য সে তাদের মাথা থেকে সোনার তাজগুলো খুলে নিতে ভোলেনি, সেগুলো সে এক-এক ক'রে তার ভাইদের মাথায় পরিয়ে দিলে, নিজেও একটা পরলো, তাতে রাক্ষস হয়তো তাদের নিজের মেয়ে ব'লেই ভাববে, আর এই সাত ভাইকে ভাববে নিজেরই মেয়ে—এই যাদের সে জবাই করতে চাচ্ছিলো।

ঠিক যেমনটা সে ভেবেছিলো, তেমনটাই হ'লো। রাক্ষস মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে আজকের কাজ আজকেই না-সেরে কালকের জন্যে তুলে রেখেছে ব'লে একটু আপশোশই করছিলো। তো সে লাফিয়ে উঠলো তার বিছানা ছেড়ে, আর তার ওই শান-দেয়া বড়ো ছুরিটা পাকড়ে নিয়ে বললে :

'দেখে আসি তো ওই পাজির পাঝাড়াগুলো এখন কী করছে। এই দাঁওটা এখন আর মুলতুবি রাখা চলবে না।'

অন্ধকারে হাৎড়ে-হাৎড়ে সোজা গিয়ে হাজির হ'লো তার মেয়েদের ঘরে, আর সোজা চ'লে গেলো সেই পালঙ্কের দিকে যেখানে ছোট্ট ছেলেগুলো শুয়েছিলো। বুড়ো আংলা বাদে সব্বাই তখন ঘুমুচ্ছিলো। সে তো তখন আতঙ্কে কুঁকড়ে-মুকড়েই প'ড়ে আছে, ভয়ে জবুথবু হ'য়ে সে টের পেলে যে রাক্ষস তার মাথায় হাত বুলোচ্ছে, আগেই সে অন্যদের মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়েছে। সোনার তাজগুলো আঙুলে লাগতেই রাক্ষস ব'লে উঠলো :

'হুম-হাম! আমি তো একটা ডাহা বুড়বাকের মতো কাজ করতে যাচ্ছিলুম। নিশ্চয়ই কাল রাতে বড্ড-বেশি মদ টেনে ফেলেছিলুম।'

এবার সে গেলো তার মেয়েদের বিছানায়, আর যখন সে হাতিয়ে-হাতিয়ে টের পেলে যে এদের মাথায় ছেলেদের টুপিগুলো পরানো, সে বললে : 'হুঁ-হুঁ বাপু, পাজি ছোঁড়াগুলো তো এইখানেই শুয়ে আছে। যাক, এবার কাজে লেগে পড়া যাক।'

এই ব'লে সে কোনো দোনোমনা না-ক'রেই নিজের সাত মেয়েরই গলা কেটে ফেললো। এই কাজটা চটপট সেরে নেয়া গেলো ভেবে সে তো মহা খুশি, ফের চ'লে গেলো নিজের বিছানায়, গিয়ে বউয়ের

পাশে শুয়ে প'ড়ে নাক ডাকতে লাগলো।

যেই বুড়ো আংলা রাক্ষসের নাসিকাগর্জন শুনতে পেলে, অমনি সে এক-এক ক'রে তার ভাইদের জাগালে, চুপি-চুপি বললে এক্ষুনি যেন জামাকাপড় প'রে তার পেছন-পেছন তারা বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা চুপিসাড়ে বাগানটায় এক-এক ক'রে দেয়ালটা ডিঙিয়ে গেলো। সারারাত ধ'রে যত জোরে পারে ছুটলো তারা, ভয়ে কেঁপে সারা, কোনো আন্দাজই নেই আবার কোথায় কোন চুলোয় যাচ্ছে।

ঘুম ভেঙে যেতেই রাক্ষস তার বউকে বললে :

'ওপরে যাও তো একবার, কাল রাতে যে পাজি ছোঁড়াগুলো এসেছিলো তাদের সাজিয়ে-টাজিয়ে দাও।'

তার স্বামীর এমন শরীফ মেজাজ আর দরাজ ছিল দেখে বউটি একেবারে অবাকই হ'য়ে গেলো, 'সাজানোগোছানো' বলতে সে যে কী বোঝাচ্ছে সেটা ঘুণাক্ষরেও তার মাথায় খেললো না। সে ভেবেছিলো রাক্ষস বুঝি বলছে তাদের জামাকাপড় পরিয়ে দিতে। তো সে ওপরের ঘরে গেলো, আর গিয়েই একেবারে থ : তার সাত মেয়েরই গলা কাটা, তারা রক্তের ধারার মধ্যেই যেন সাঁতার দিচ্ছে।

দেখেই সে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলো গোড়ায়, এ-রকম অবস্থায় যে-কোনো মেয়েই যা ক'রে থাকে। রাক্ষস ভাবলে তার বউ একা-একা বুঝি মশলা-টশলা মাখিয়ে অতজনকে 'সাজাতে-গোছাতে' পারছে না, অনেকটাই সময় নিয়ে নেবে সে, তাই তার কাজে হাত লাগিয়ে সাহায্য করবার জন্যে সে নিজেই চ'লে এলো ওপরে। ওই ভয়াবহ দৃশ্যটা চোখে পড়তেই সে নিজেও তার বউয়ের চেয়ে কম স্তম্ভিত হ'লো না, তারও পুরো আক্কেলটাই যেন গুড়ুম!

'অ্যাঁ! এ আমি কী করেছি?' চেঁচিয়ে-মেচিয়ে সে বলতে লাগলো। 'হুঁ, ওই খুদে শয়তানগুলোকে এর জন্যে কড়ায়-গণ্ডায় সব উশুল ক'রে দিতে হবে।'

একটা জগভর্তি জল ঢাললে সে তার বউয়ের চোখেমুখে, তারপর তার জ্ঞান ফিরতেই বললে :

'শিগ্‌গির, চটপট আমার ওই একেক কদমে সাত লিগ যাবার বুট জোড়া বার ক'রে দাও। এক্ষুনি আমি হতভাগাগুলোর পেছন নেবো।'

এই জুতো পায়ে একেক কদম ফেললেই সাড়ে দশ ক্রোশ পথ পেরিয়ে যাওয়া যায়। সারা দেশটাই সে চ'ষে ফেললে, ক্রোশের পর ক্রোশ পথের দু-ধার তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে, সে এসে পড়লো সেই পথে যে-পথ ধ'রে ওই ছোটো ছেলেগুলো গেছে, এখন তারা তাদের বাবা-মার কুঁড়ে বাড়ির প্রায় দুশো হাতের মধ্যেই এসে পড়েছে। তারা দেখতে পেলে রাক্ষসটা পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে চ'লে আসছে, পথের নদীগুলো লাফিয়ে পেরুচ্ছে এমন সহজে যেন সেগুলো নেহাৎই ছোটো-ছোটো খাল। বুড়ো আংলা দেখতে পেলে পাশেই একটা বিশাল পাথর প'ড়ে আছে, তার তলায় একটা ফোকর, সে তার ভাইদের ওই ফোকরের ভেতরেই পাঠিয়ে দিলে, আর নিজে রইলো মুখটাতেই গুঁড়ি মেরে : রাক্ষস কী করে দেখবে ব'লে। রাক্ষস তো ততক্ষণে তার এই হুড়মুড় নিষ্ফল লম্বা ছোটাছুটির পরে (এক কদমে সাত লিগ পেরুবার জুতোগুলো পায়ে দিলে ক্লান্তি একটু বেশিই হয়) খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, জিরিয়ে নেবার জন্যে সে একটু থামলে এখন। আর জিরোবার জন্যে বসবি তো বস, বসলো কি না সেই পাথরটার ওপরেই, যার তলায় ছেলেগুলো লুকিয়ে আছে।

সে যেহেতু অবসাদে প্রায় ভেঙেই পড়ে আর-কি, সে একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়লো, আর এমন ভীষণ নাক ডাকাতে লাগলো যে সেই বিকট আওয়াজ শুনে ছেলেগুলো বিষম ঘাবড়ে গেলো, ঠিক যেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলো আগের রাতে সে যখন ওই মস্ত ছুরিটা হাতে তুলে নিয়েছিলো। বুড়ো আংলা কিন্তু মোটেই

তত ঘাবড়ে যায়নি। সে তার দাদাভাইদের বললে রাক্ষস যখন ঘুমুচ্ছে তখন এই ফাঁকে এক ছুটে বাড়ি চ'লে যেতে, তার জন্যে তাদের আর মিথ্যে ভাবতে হবে না। সে যা বললো, ঠিক সেই মতোই করলো তারা, আর চটপট বাড়ি পৌঁছে গেলো।

বুড়ো আংলা সোজা চ'লে গেলো রাক্ষসের কাছেই, তারপর আলতো ক'রে টেনে তার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে ফেলে সে নিজেই তাতে পা গলিয়ে দিলে। জুতো জোড়া তো মস্ত আর চওড়া, কিন্তু তারা তো কুহক জুতো, তারা ইচ্ছে মতো যে পায়ে দেয় তার পায়ের মাপেই ছোটো কিংবা বড়ো হ'য়ে যেতে পারে। সহজেই তারা বুড়ো আংলার পায়ে এমনভাবে খাপ খেয়ে গেলো যেন তার পায়ের মাপেই ওই একেক কদমে সাত লিগ যাবার জুতো জোড়া বানানো হয়েছে।

সে সোজা চ'লে গেলো রাক্ষসের বাড়িতে, গিয়ে দ্যাখে রাক্ষসের বউ তার মেয়েদের শোকে হাপুশ-হুপুশ ক'রে কাঁদছে।

'আপনার স্বামীর কিন্তু,' সে বললে, 'সামনেই মস্ত বিপদ। ডাকাতদের একটা দল তাঁকে পাকড়ে ফেলেছে, যদি-না এক্ষুনি তাঁর সব সোনারুপো তাদের তিনি দিয়ে দেন তবে তারা তাঁকে কোতল করবে ব'লে হলফ করেছে। তো ওরা যখন তাঁর গলায় ছুরিটা ধরেছে, তখন হঠাৎ আমার ওপর তাঁর চোখ প'ড়ে গেছে, দেখে আমাকেই তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর মহা বিপদের কথা জানাতে, বলেছেন আপনাকে এসে যেন সব জানাই, যা-কিছু ধনরত্ন আছে সব আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আর সব মানে *সব*—একটা-কিছু দামি জিনিশও যেন আর না-থাকে—নইলে তারা তাঁকে কোতলই ক'রে ফেলবে, এক ফোঁটাও দয়া দেখাবে না। একটুও তো নষ্ট করার মতো সময় ছিলো না, তাই আমাকেই তিনি একেক কদমে সাত লিগ যাবার জুতো জোড়া দিয়ে দিয়েছেন। দেখছেন তো আমি এখানে তা-ই প'রে এসেছি, যাতে চটপট যাওয়া-আসা করতে পারি, আর আমি যে আপনাকে কোনো ধাপ্পা দিচ্ছি না—তারও প্রমাণ এই জুতো জোড়া।'

বউটি খুবই ভালো, সব কথা শুনে সে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছে, তক্ষুনি যত হিরে-জহরৎ ধনরত্ন তাদের কাছে ছিলো, সব সে তাকে এনে দিলে। রাক্ষস হ'লে কী হয়, স্বামী হিশেবে সে চমৎকার, যদিও সে ছোটো-ছোটো ছেলেপিলে পেলেই কেটে-কুটে খায়। বুড়ো আংলা রাক্ষসের সব ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে, সোজা গিয়ে উঠলো তার বাবার কুঁড়ে ঘরে, সেখানে তাকে তো আদর ক'রে দু-হাত বাড়িয়েই বুকে টেনে নেয়া হ'লো।

অনেকেই আছে, যারা এই শেষ ঘটনাটায় মোটেই সায় দেয় না। বুড়ো আংলা যে এইভাবে লুঠপাট ক'রে রাক্ষসকে একেবারে পথে বসিয়ে এসেছে, সেটা তারা বিশ্বাসই করে না। তারা বলে, সে যদি তার পা থেকে একেক কদমে সাত লিগ যাবার জুতো খুলে নিয়ে থাকে তো সেটা এই জন্যেই যে রাক্ষস ওই জুতো পায়ে দিয়েই ছোটোদের তাড়া ক'রে বেড়াতো এবং সে যাতে সেইকাজ আর না-করতে পারে, সেইজন্যেই। তারা নাকি খুব বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকেই জেনেছে, ওই কাঠুরের বাড়িতে এসে তারা নাকি খানাপিনাও করেছে। তারা বরং জোর দিয়েই বলে যে বুড়ো আংলা রাক্ষসের ওই জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে সোজা চ'লে গেছে রাজদরবারে, সেখানে গিয়ে শুনতে পায় যে দুশো লিগ দূরে নাকি দুশমনদের দল এসে হানা দিয়েছে, আর এক তুমুল লড়াই শুরু হ'য়ে গেছে—তার যে কী ফল হয়েছে তা কেউ জানে না ব'লেই সব্বাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে।

তারা বলে সে নাকি সোজা রাজার কাছে গিয়ে বলে, তিনি যদি চান তো একদিনের মধ্যেই সে সব

খবর নিয়ে আসতে পারবে। সে যদি তা-ই করতে পারে, তো, রাজা কথা দেন, তাকে বিশাল টাকাকড়ি ইনাম দেবেন। বুড়ো আংলা সেদিনই সন্ধেবেলায় খবর নিয়ে এসে হাজির হয়েছিলো, আর তার প্রথম অভিযানেই দারুণ নাম কামিয়ে সে বুঝতে পেরেছিলো যে সে এইভাবে অনেক টাকাকড়ি কামাতে পারবে। কারণ ফৌজের কাছে তাঁর সব নির্দেশ নিয়ে পৌঁছে দেবার জন্যে রাজা তাকে জমকালো সব বখশিশ দেন, আর অনেক মহিলা তাঁদের প্রণয়ীদের খোঁজখবর এনে দেবার জন্যে তাকে বলেন সে যা চাইবে তা-ই তাঁরা তাকে দেবেন। আর এই কাজেই সে সবচেয়ে বেশি টাকা কামিয়েছিলো।

অনেক বউও ছিলেন, যাঁরা তাঁদের স্বামীর কাছে তাঁদের চিঠি নিয়ে যাবার জন্যে তাকে একটু-আধটু টাকা দিতেন, আর সে এমনই একটু-আধটু যে সে কখনও খেয়ালই করেনি হরকরার কাজ ক'রে সে কত টাকা কামিয়েছে।

রাজদূত হিশেবে কিছুদিন কাজ ক'রে, খুব টাকাপয়সা রোজগার ক'রে, বুড়ো আংলা ফিরেছিলো তার বাবার কাছে, আর সেখানে সব্বাই দারুণ খুশি হ'য়েই তাকে বরণ ক'রে নিয়েছিলো। পুরো সংসারটার জন্যেই সে সুখসমৃদ্ধি উপার্জন ক'রে নিয়ে এসেছিলো। তার বাবা আর ভাইদের জন্যে সে নতুন-নতুন সৃষ্টি-হওয়া রাজকাজের খোঁজ নিয়ে এসেছিলো, আর সেইভাবে সবাইকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলো, আর দরবারে নিজের আসনটাও পাকাপাকিভাবে কায়েম ক'রে নিয়েছিলো।

কেউ-কেউ বলে রূপকথা নাকি শুধু ছোটোদেরই মনকে ভোলায়,
ঠাকুমা বলেন নাতি-নাৎনিকে, যখন নিদ্রা তাদের দোলায়।

দুই গ্রিম ভাই এসে বললেন, মোটেই তা নয়, এ-সব গল্প
গ্রাম-শহরের লোককথাতেই থেকে গিয়েছিলো অল্পস্বল্প।
পরে দিনেমার আন্ডেরসেন সেই কথা ঠিক মানতে চাননি,
নিজের লেখার জন্যেই তাঁর বিশ্বে এতটা গণ্যিমান্যি।

ফরাশি দেশের শার্ল পেরো যদি লোককথা কিছু মনেও রাখেন
লেখার সময় তাতে তিনি বেশ নিজের মতনই আখর আঁকেন—
লৌকিক সব গল্পের সাথে মেশান নিজের যা-যা জল্পনা,
এবং সত্যি-মিথ্যেয় মিশে শত রঙে ভরে তাঁর কল্পনা।

পেরোর জন্ম ষোলোশো আটাশে, অর্থাৎ সেটা সতেরো শতক,
পালটে যাচ্ছে যখন লোকের মনের গড়ন, রুচি আর শখ।
ভিন্ন শতক আসতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে সতেরোশো তিনে—
হাঁসের মায়ের কল্পকাহিনী ছাপ ফেলে গেছে দেশে ততদিনে।

তাই শার্ল পেরো এখনও আসীন সামনের সারে, ঠিক পুরোভাগে,
এবং এখনও—কী ছোটো কী বড়ো—সকলেরই তাঁকে খুব ভালো লাগে।